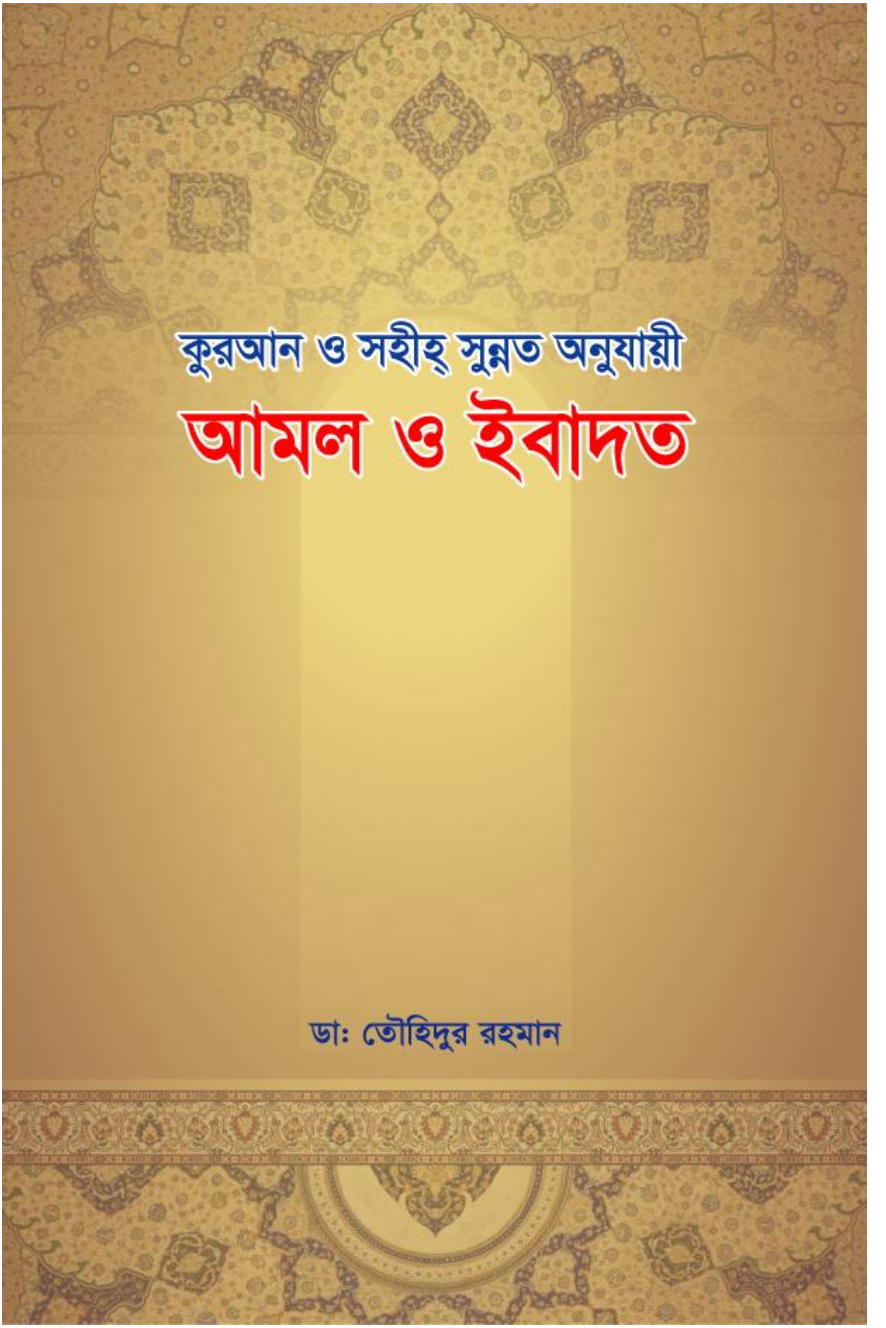
কুরআন ও সহীহ্ সুন্নত অনুযায়ী
আমল ও ইবাদত
ডাঃ তৌহিদুর রহমান

কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাত অনুযায়ী আমল ও ইবাদত

[আমাদের আমল ও ইবাদতে এবং ঈমান আক্বীদাতে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস মোতাবেক যে সমস্ড় বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান তার উপর আলোকপাত এবং আমাদের প্রিয় নবী (সা:) এর সহীহ্ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ড় বিষয়গুলো সহীহ সূত্র দ্বারা বর্ণনা]

ডাঃ তৌহিদুর রহমান
নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

www.waytojannah.com

কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাত অনুযায়ী আমল ও ইবাদত

ডাঃ তৌহিদুর রহমান

নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

গ্রন্থস্বত্ত্ব:
লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ:
রমজান : ১৪৩৬ হি:
জুলাই : ২০১৫ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ:
মোহাম্মদ ইউসুফ

গ্রাফিক্স ডিজাইন, বর্ণ বিন্যাস ও মুদ্রণ:
সাইলেক্স
হোটেল ইন্টারন্যাশনাল (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল-া, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-৬২০৮২৯

মূল্য : ১১০ (একশত দশ) টাকা মাত্র।

Quran O Shahi Sunnah Onujayee Amal O Ebadat by Dr. Tawhidur Rahman, Specialist in Neurology, Chittagong Medical College & Hospital, Bangladesh. **Price: Tk. 110 Only**

কেন এই বই?

বিসমিল-াহির রাহমানির রাহীম

- *আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো। (সূরা আল হাশর: ৫৯/৭)*

- *রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোন সুন্নাতকে পুনর"জ্জীবিত করবে, যা আমার মৃত্যুর পর নিস্প্রাণ তথা অস্ড়িত্বহীন হয়ে গিয়েছিল, সে তাদের আমলেরও সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। যারা তাকে দেখে উক্ত সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে। এমতাবস্থায় তাদের সওয়াবে কোন প্রকারের কম করা হবেনা। [সহীহ। তিরমীযি হা/২৬৭৭, ইবনে মাজাহ হা/২১০,তাবারানী হা/১০]*

আমি কোন আলেম বা ইসলামিক বিদ্যান না হয়ে একজন সাধারণ মুসলিম হয়েও এই বই লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছি বলে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি গুর"জনের কাছ থেকে এবং মহান আল-াহ তাআলার কাছে সাহায্য চাচ্ছি যে কোন ভুল শিক্ষা যেন আমার থেকে ছড়িয়ে না পড়ে। আমি যেন সহীহ রীতিনীতিই মানুষকে জানাতে পারি।

আসলে কয়েকটি ঘটনা আমার মনে দাগ কাটে, যেমন- আমার হজ্বের সময় মীনার তাঁবুতে একবার কাফেলার একজন বড় আলেম এর সঙ্গে হাজীদের ঝগড়া লেগে যায়। তিনি খেয়াল খুশিমত আছরের জামাতের সময় পরিবর্তন করছিলেন। সে সময় এক পর্যায়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, বুখারী, মুসলিম শরীফ সাধারণ মানুষের জন্য নয়, এর মর্ম আপনারা কি বুঝবেন? শুধুমাত্র আলেমদের মারফতে আপনাদের হাদীস বই জানতে হবে। কোন হাদীস নিয়ে সাধারণ মানুষ কোন কথা বলতে পারবেনা। সেই আলেমদের চাপিয়ে দেয়া চিন্ড়া-ভাবনা ও আমাদের নিস্পৃহতা সব ক্ষেত্রেই বিরাজমান। আমার এক বন্ধু তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনে খতমে বুখারী করাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম বুখারী শরীফ কখনো পড়েছো কি? উত্তর দিল, বুখারী শরীফ কি আমরা পড়তে পারবো? আমি তো জানি বুখারী শরীফ খুবই কঠিন। আলেম ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়।

অথচ হাদীস গ্রন্থগুলোতে এখন এত চমৎকার বাংলা অনুবাদে অধ্যায়ে ভাগ করে, বিষয়ভিত্তিক আলাদা করে সহীহ, দুর্বল, জাল হাদীসে ভাগ করে বর্ণিত আছে যে, সাধারণ একজন শিক্ষিত মানুষ খুব সহজে সব মাসয়ালা বুঝতে পারবে। যেমন হাদীসের প্রধান দুই প্রকারভেদ।

গ্রহণযোগ্য হাদীস:

(ক) সহীহ– যে হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সনদটি শা'জ (একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বক্তব্য আরেকজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বক্তব্যের মধ্যে যদি গরমিল হয়) এবং মু'আল-াল (প্রশ্নবিদ্ধ) না হয়, তাকে সহীহ্ হাদীস বলে।

(খ) হাসান– যে হাদীসের বর্ণনকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট চারটি শর্ত বহাল আছে, তাকে হাসান বলা হয়।

অগ্রহণযোগ্য হাদীসঃ

যঈফ বা দুর্বল হাদীস– যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মাঝে) সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। প্রধানত: দু'টি কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়:

১) সনদ থেকে বর্ণনাকারীর বাদ পড়ে যাওয়া,

২) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ (দ্বীনদারী সম্পর্কিত অথবা স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত) থাকা।

অন্যরকম কিছু ঘটনা, একবার আমার বুকে হাত বেঁধে এবং রফউল ইয়াদাইন করে নামাজ পড়া দেখে একজন আত্মীয় আরেকজনকে বললেন, এটা শিয়াদের নামাজের নিয়ম। অন্য এক জায়গায় একজন লোক বিনীতভাবে মসজিদে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কোন মাযহাবের লোক? আমার একজন কলিগ যখন গ্রামের বাড়ীতে সহীহ সব সুন্নাত মেনে মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ল, নামাযের পরে উনাকে নিয়ে রীতিমত মিটিং বসল। এ লোকের তো জাত-পাত সব গেল অবস্থা। এ কোন রীতি, অনাচার শুর" করলেন উনি? দু'একজন আমার পরিচিত ভদ্রলোক এমনও বললেন যে, বাড়িতে উনি সহীহ হাদীসভিত্তিক রাসূল (সাঃ) এর নিয়ম অনুযায়ী নামাজ পড়েন। কিন্তু মাসজিদে গতানুগতিক নিয়মে নামাজ পড়েন, লোকেরা বড় প্রশ্ন করে, উত্তর জানা না থাকায় বিব্রত হন।

কেউ কেউ বলেন, সব জানি, সহীহ পদ্ধতি তাও মানি, কিন্তু অস্বস্ড়ি লাগে, সবার সামনে এভাবে পড়তে বা এতদিনের শেখা নিয়ম পরিবর্তন করতে ইচ্ছে হয় না। এক্ষেত্রে সামাজিকতার ভয়ে সহীহ পদ্ধতি জেনে শুনেও পালন না করা অনেকটা রিয়া (লোক দেখানো ইবাদাত) এর পর্যায়ে চলে যায় না কি?

কমপক্ষে তিনজন ইমাম, মুয়াজ্জিন আমার কাছে গোপনে স্বীকার করেছেন যে, শুধুমাত্র চাকরী বাঁচানোর জন্য শবেবরাত পালন, মীলাদ বিদআত জেনেও তারা ওয়াজ করেন, সহীহ অনেক সুন্নাত পদ্ধতি ছেড়ে দেন ও ফরজ নামাযের পরে রেগুলার মুনাজাত (সম্মিলিত) এর কোন অস্ড়িত্ব নেই জেনেও উনারা তা করেন। নাহলে চাকরী থাকবেনা।

দেখা যাচ্ছে, আমরা অনেকে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যাংকার, ব্যারিষ্টার, চাটার্ড একাউন্টেন্ট, এমবিএ করে ফেলছি, অনেক কঠিন কঠিন বই পড়ে পাশ করে। আবার ৩০০/৪০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস শেষ করছি হরদম, ৩ ঘন্টা করে বসে বসে সিনেমা দেখছি, সারাদিন ধরে ক্রিকেট ম্যাচ দেখছি অথচ আমাদের কারো সময় বা ইচ্ছা নেই একটু একটু করে সব না হলেও প্রধান প্রধান হাদীস বইগুলি একটু পড়ি। কুরআনের তাফসীর একটু পড়ি। এতে পুরোপুরি অজ্ঞ থাকার কারণে আমাদেরকে যা আলেম, ইমাম সাহেবরা বুঝাচ্ছেন আমরা তাই বুঝে সন্তুষ্ট থাকতে চাচ্ছি, তথাকথিত ঝামেলা (??) বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব (!!) তৈরী করতে চাচ্ছিনা। যেহেতু আলেমরা বলেন, এগুলো আমাদের বুঝার সাধ্য নেই, সুতরাং উটকো ঝামেলা ডেকে এনে কষ্ট বাড়ানোর কোন প্রয়োজন দেখিনা।

সৌদী আরবের ধর্মমন্ত্রণালয় হাজীদের জ্ঞান বিতরণের জন্য বিনামূল্যে লিফলেট বা বই বিলি করেন। এসব বই পড়ে প্রথম জানলাম মীলাদুন্নবী, শবেবরাত সবই বিদআত, আমাদের ধর্মে এসবই নব উদ্ভাবিত জিনিস, যা রাসূল (সাঃ) নির্দেশিত নয়। মিনার তাবুতে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে একজন ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন ও সূরা দুখানের ২য়, ৩য় আয়াত খুলে দেখালেন, শবে বরাতের কথা কুরআন শরীফে উদ্ধৃত আছে বলে।

আমি তখন শুধু আরবীতে কুরআন পড়া মুসলমান, চুপ করে গেলাম। পরে দেখলাম সবচেয়ে বিখ্যাত কুরআনের তফসীর "তাফসীর ইবনে কাসীর", আরো আছে "মারেফুল কুরআন" এ, এই আয়াতের তাফসীরে শুধু শবে কদরের রাত্রির কথা বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য সহীহ তাফসীর গ্রন্থগুলোতেও তাই। নিজে পড়ালেখা না করে, শুধু শোনা কথায় ভিত্তি করে আমল করলে ঠকে যাবেন এবং এর কোন যুক্তিসঙ্গত অযুহাত কি দেখাতে পারবেন? কারণ শেষ বিচারের দিনে আপনার দায়িত্ব কেউ নেবেনা।

আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের ব্যপারে প্রফেসরের সিদ্ধান্ড়, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট করা বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ড় নিতে চাই। মানি যে, দেশে হলে ঢাকা মেডিকেলের বা এপোলোর বিশেষজ্ঞের মতামত অগ্রগন্য। ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর বা আমেরিকার ডাক্তাররা হলো শ্রেষ্ঠ, ওদের মতামতের গুর"ত্ব অনেক বেশী। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ান কোচের কদর বেশী, টয়োটা গাড়ি হচ্ছে মার"তী গাড়ি হতে শ্রেষ্ঠ, উমুক আরকিটেক্ট ডিজাইনে সবচেয়ে ভাল, মামলা মোকদ্দমাতে শ্রেষ্ঠ উকিলের পরামর্শ নিই। অথচ, ধর্মের ব্যপারে আমরা যখন দেখি আমাদের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনার আলেমগণ, পৃথিবীর বড় বড় আরব মুহাদ্দীসগণ যে ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছেন, সে ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। সেক্ষেত্রে হাতের কাছে যা পাচ্ছি তাই যথেষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। মক্কা-মদীনা সহ পুরো আরব বিশ্বে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মুসলিমের দেশ ইন্দোনেশিয়া সহ, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশে কোথাও শবে মিরাজ, মীলাদুন্নবী ও শবে বরাত পালন হয় না এই ভারত ,পাকিস্ড়ান বাংলাদেশ ও আফ্রিকার কিছু ও মীসরের কিছু স্থান(পুরো নয়) ছাড়া। আমরা তা পালন করে যাচ্ছি। এখন তো আপনি কোন অযুহাত পাবেন না,কারণ প্রত্যেকটি হাদীস বই এখন আরবীসহ, সঠিক তরজমাসহ, কেন জাল, কেন সহীহ ব্যাখ্যাসহ বাংলাতে অনুবাদ হয়ে একদম আপনার কাছে পেশ করা হচ্ছে সুন্দর গ্রন্থাকারে। একমাত্র বুখারী, মুসলিমে কোন জাল-যয়ীফ হাদীস নেই। আর প্রত্যেকটি হাদীস গ্রন্থে জাল, যয়ীফ, মউযু হাদীস সহীহ হাদীসের সাথে মিশ্রিত আছে। সেজন্য বুখারী ও মুসলিম শরীফের আগে সহীহ লেখা থাকে আর বাকী হাদীস গ্রন্থগুলোতে লেখা থাকে সুনান। যেমন সুনান আত-তীরমিযী, সুনান আবু দাউদ ইত্যাদি। কিন্তু এতেও এখন কোন সমস্যা নেই। সহীহ তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাযাহ এভাবে সমস্ড় সহীহ হাদীসগুলোকে একত্র করে ও দুর্বল হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করে আলাদা আলাদা বই বের হয়ে গেছে যাতে প্রত্যেক হাদীসের জন্যই ব্যাখ্যা করে দেয়া আছে। আপনি জীবনে এত কঠিন কঠিন বই পড়েছেন যে আপনার জন্য এগুলো পানিভাত মনে হবে। আপনি একটু পড়লেই জানতে পারবেন, নামাজ পড়ার সহীহ নিয়ম, পোষাকের ধরণ, কোনটি হারাম, কোন কাজটি এতদিন করা যাবেনা জেনে এসেছেন, অথচ তা সম্বন্ধে সহীহ হাদীস বিদ্যমান অথবা যা জানতেন করা যাবে, আসলে তাঁর সম্মন্ধেই নবীজীর কঠোর সতর্কবাণী আছে।

যেমন, বাজারে দেদারসে সিল্কের পাঞ্জাবী/শার্ট বিক্রি হচ্ছে, অথচ আপনি কি জানেন ইসলামে পুর"ষের জন্য সিল্ক এর পোষাক হারাম?

যেমন আরেকটি উদাহরণ, একদিন জুম্মার নামাজে খুতবা চলাকালীন ঢুকে আমি দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামাজ পড়ে বসেছি, নামাজ শেষে আমার কয়েকজন

কলিগ আমাকে ধরলো- খুতবার সময় কোন নামাজ পড়া যাবেনা, খুতবা শোনা ওয়াজিব, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামাজ নফল, অথচ বুখারী শরীফে স্পষ্ট দুইটি হাদীস বিদ্যমান যে,

"নবীজী (সাঃ) নিজে খুতবা দেয়াকালীন একজন সাহাবী মসজিদে ঢুকে বসে পড়েছিলেন এবং তখন তিনি খুতবা বন্ধ করে উনাকে দুরাকাত নামাজ পড়ে তারপর বসার আদেশ দেন এবং মসজিদে ঢুকে দুরাকাত নামাজ না পড়ে বসার জন্য কঠোর সতর্কবাণী শোনান"। একথা জানার পর উনারা ভুল বুঝতে পারেন। শবে বরাতে নামাজ পড়া নিয়ে কথা বলাতে একজন খুব কাছের মানুষ একবার রেগে গিয়ে বললেন, আপনি যে হাদীসগুলোকে জাল বলছেন তা কিভাবে নিশ্চিত হলেন, তাহলে কি উমুকে ভুল বলছেন? যদি ইমাম বুখারী (রাঃ), বা ইমাম তিরমীযী (রাঃ), বা শেখ আব্দুল-াহ বিন বায বা শেখ নাসির-দ্দিন আলবানীর (রাঃ) এর মত মুহাদ্দীসগন, হাদীস বিশারদগণ তাদের মতামত দেন, মক্কা-মদিনা সহ বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে সহীহ সুন্নাত পড়ানো হচ্ছে আর রাসুল (সাঃ) এর বিখ্যাত হাদীস যাতে উনি (সাঃ) বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে যখন সারা দুনিয়ার মানুষ হন্য হয়ে ইলম খুঁজবে, তবে মদীনার আলেমের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ কোন আলেম তারা খুঁজে পাবে না।" (বু: ১৮৭৬ ও মু: ৩৭২)- সেই মক্কা মদীনা তে বড় বড় ইসলামিক বিদ্বানরা নিয়মিত গবেষণা করে মতামত দিচ্ছেন সেখানে আপনি এখানকার কিছু ওয়াজ বা পুস্তিকার লেখক কেই মুল্য দেবেন কিনা সেই দায় দায়িত্ব আপনার।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে, বস্তির ঐ দিনমজুর বা অশিক্ষিত ওরাও বিদাতের দোষে গুনাহ করছে, ওদের কি হবে তাহলে? আল-াহ তাআলা সবাইকে তাঁর নিজস্ব সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিচার করবেন, যা পবিত্র কুরআনে কয়েক জায়গায় উলে-খ আছে, সুতরাং আপনি যেখানে শিক্ষিত, হাত বাড়ালেই আপনার নাগালে ইন্টারনেট, আপনি চাইলেই বাজার থেকে বই কিনে পড়তে পারেন। আপনার সাথে ঐ অশিক্ষিত গরীব লোকগুলোর তুলনা আপনি করতে পারেননা। এ ব্যাপারে আপনার প্রতি আল-াহ তাআলার জিজ্ঞাসা ও বিচার একই থাকবে ও আপনার অযুহাত কি একই থাকবে বলে আপনি মনে করেন?

পরিশেষে বলতে চাই, আমি এই বইটা লিখেছি নিজেই জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে এবং তার সাথে একটু ইচ্ছা আছে কাছের মানুষগুলোকে এবং যারা আগ্রহী আরো পড়ালেখা করে সহীহ ইসলামিক রীতিপদ্ধতি, নিয়ম-কানুন জানতে তাঁদেরকে একটু সাহায্য করা। আমি পরামর্শ দেব আমার বইটাকে শুধুমাত্র সাহায্যকারী বা গাইড এর মত বিবেচনা করে নিজেই সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলো ও অন্যান্য ইসলামিক বিদ্যানের যেসব বইয়ের রেফারেন্স আমি দিয়েছি সেগুলো পড়ে নিজেই জ্ঞানলব্ধ হোন এবং কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল কর-ন ও বিদআত, গোনাহ ও শিরক থেকে বেঁচে থাকুন।

মহান আল-াহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞানলব্ধে সাহায্য কর-ন। আমীন

ডাঃ তৌহিদুর রহমান

বি: দ্র: এ বইতে যেসব রেফারেন্স বই ও সংক্ষিপ্ত সংকেত দেওয়া হয়েছে তার একটি তালিকা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় উলে-খ আছে।

সূচি

১। উযু ও সালাতের ক্ষেত্রে সহীহ হাদিস মোতাবেক পালনে আমাদের ভুলগুলো আর কিছু সুসাব্যস্ড় সুন্নত না জানার কারণে উপেক্ষা করে সওয়াব বঞ্চিত হওয়া ও আমল ত্রুটি যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রগুলো ৯

উযুঃ

* সম্পূর্ণ মাথা মাসহ করা ও ঘাড় বা গর্দান মাসহ না করা ৯
* মাথা মাসহ করায় সাথে সাথে দুই কান মাসহ করা ১০
* উযুর শুরুতে বিসমিল-াহ্ বলে শুরু করতে হবে ১০

সালাত

* জামাতে নামজ আদায় করা মুসলমান পুরুষের জন্য ওয়াজিব ১০
* জামাতে নামাযের মর্যাদা ও ফযীলত ১১
* রফউল ইয়াদাইন করা ও সালাত শুরু করা ১১
* জায়নামাজের দোয়া বলে কিছু না থাকার ব্যাপারে হাদীস প্রমাণ ১২
* তাকবীরে তাহ্রীমার পর হাত কোথায় বাঁধবেন ১৩
* ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ১৫
* সরব বা যেহরী জামাতের নামাজে জোরে আমিন বলা ১৯
* ক্বিরআত পড়ার পর আল-াহু আকবর বলে রুকুতে যাওয়া ও রফউল ইয়াদাইন করা এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাড়ানো ও তৃতীয় রাকাতের শুরুতে রফউল ইয়াদাইন করা ২১
* নামাজের দৃষ্টি বিভিন্ন জায়গায় রাখা সহীহ নয়। রুকু ও কিয়ামে সর্বাবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখতে হবে ২৪
* দ্বিতীয় ও শেষ বৈঠকে দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে রাখতে হয় ২৫
* রুকু ও সিজদা ধীর স্থিরভাবে পূর্ণতার সাথে আদায় না করলে নামায হবে না ২৬
* দুই সিজদার মধ্যবর্তী স্থানে দো'আ ২৭
* দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে ক্ষণিক বসা সুন্নত ২৮
* সালাতে শেষ বৈঠকে বসার পদ্ধতি ২৮
* সহো সিজদাহ ২৮
* বিতর নামাজ ৩১
* শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে দোয়া ৩৮
* সম্মিলিত মুনাজাত ও সম্বস্বরে আমীন, আমীন বলে মুনাজাত করার সহীহ কোন দলীল নেই ৩৯
* নামাজে সালাম ফিরানোর পর সুসাব্যস্ড় সুন্নত হলো যিকির করা ৪৬
* নারী ও পুরুষের সালাত পদ্ধতির পার্থক্য নেই ৫০

২। **মাযহাব মানা না মানা ও প্রকৃত চিত্র** ৫১
* বহুল আলোচিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ৬৩

৩। **বিদ'আত** ৬৮

৪। **মিলাদ** ৭৮
৫। **শবে বরাত** ৮২
৬। **ঈদে মীলাদুন্নবী** ৯২
৭। **বিবিধ নিষিদ্ধ ও অবশ্য পালনীয় আমলসমূহ** ৯৬
* নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তারপর দাওয়াত দেয়া ৯৬
* গোড়ালীর নিচে কাপড় যথা প্যান্ট, লুঙ্গি, পায়জামা ঝোলানো নিষেধ ৯৭
* পুরুষদের জন্য রেশম (সিল্ক) কাপড় ও স্বর্ণ হারাম ৯৭
* নামাজ না পড়া মানে ৯৮
* নামাজ না পড়ার পরকালীন শাস্তি ৯৮
* তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করার বিধান ৯৯
* ইকামাত হয়ে গেলে ফরজ নামাজ ছাড়া আর নামাজ নাই ১০০
* ফজরের সুন্নত ফরজের আগে আদায় করতে না পারলে ১০০
* পুরুষদের জন্য হলুদ রঙ এর পোষাক পরিধান মাকরূহ ১০০
* কালো কলপ ব্যবহার নর-নারী সকলের জন্য নিষিদ্ধ ১০১
* সুদ ১০১
* গীবত ও চোগলখোরী ১০২
* তাবিজ ব্যবহার ১০৫
* মৃত্যুর পর মানুষ যা দ্বারা উপকৃত হবে ১০৬
* শিষ্টাচার ও অন্যান্য ১০৯

উযু ও সলাতের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস মোতাবেক পালনে আমাদের ভুলগুলো আর কিছু সুসাব্যস্ড় সুন্নত না জানার কারনে উপেক্ষা করে সওয়াব বঞ্চিত হওয়া ও আমল ত্রুটিযুক্ত হওয়া ক্ষেত্রগুলো-

উযুঃ

সম্পূর্ণ মাথা মাসহ করা এবং ঘাড় বা গর্দান মাসহ না করা

১) আব্দুল-াহ ইবনে যাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল-াহ (সাঃ) দু'হাতে মাথা মাসহ করলেন, তিনি হাত দু'টা সামনে আনতেন ও পিছনে নিতেন। তিনি মাথার সামনের দিক থেকে শুর ু করে উভয় হাত ঘাড়ের দিকে নিতেন অতঃপর পিছন থেকে আবার সামনের দিকে এনে শুর ু করার জায়গায় পৌছাতেন, অতঃপর তিনি উভয় পা ধুতেন। - সহীহ, তিরমিযী হা/৩২, ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪।

২) ইয়াহিয়া আল মাযিনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে আব্দুল-াহ ইবনু যায়দ (রাঃ) উযু করার পদ্ধতি বর্ণনা করলেন, পুরো বিস্ড়ৃত উযুর বর্ণনা ---, তারপর মাথা দুই হাত দিয়ে মাসহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে ও পিছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুর ু করে উভয় হাত পিছনের চুলের শেষ পর্যন্ড় নিলেন, তারপর আবার যেখান থেকে শুর করেছিলেন সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন, তারপর দু'পা ধুলেন। - সহীহ বুখারী- ১৮৫, আহমদ-১৬৪৪৫, মুসলিম ২/৭- হা/২৩৫। অনুরূপ আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে, বুঃ- ১৮৬, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯, তিরমিযী- ৩৪, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ ৪৫।

ঘাড় মাসহ করার পক্ষে সহীহ কোন হাদীস নেই

-ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) সূত্রে হাদীসটি জাল। [ত্বাবারানী কাবীর হা/১৭৫৮৪, ২২/৫০] [সিলসিলা যইফাহ হা/৬৯, ৭৪৪]

-আমর ইবনু কা'ব সূত্রে অপর হাদীসটিও জাল। [ত্বাবারানী কাবীর ১৯/১৮১]

-ত্বালহা ইবনু মুছাররফ সূত্রে বর্ণিত আবু দাউদের ১৩২ নং হাদীস সম্বন্ধে ইমাম আবু দাউদ নিজেই টিকা লিখেছেন যে, আমি ইমাম আহমদ কে বলতে শুনেছি, ইবনু উ'অইনাহ বলতেন, মুহাদ্দিসগণ ধারনা করতেন এটা সহীহ হাদিসের ব্রিোধী। তিনি এটাও বলতেন ত্বালহা তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে একথা কোথায় পেল?

হাদীসটি মুনকার বা অস্বীকৃত।

আরেকটি হাদীস- "ঘাড় মাসহ করলে বেড়ী থেকে নিরাপদ থাকবে।" জাল হাদীস (সিলসিলা যইফাহ- ৬৯)। ইমাম সুয়ূত্বী জাল হাদিসের গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(হাফেজ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী আল-লাআলিল মাসনূ'আহ্ ফিল আহাদীছিল মাওযুয়াহ, পৃঃ ২০৩)। [সুত্র- মুঃ বিন মহসিন- ৪৯-৫১ পৃঃ]

মাথা মাসহ করার সাথে সাথে দুই কান মাসহ করতে হবে

আব্দুল-াহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি উযুর নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, অতঃপর নবী (সঃ) তার মাথা মাসহ করার পরে তার দুহাতের শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয়কে তার দুকানের ছিদ্রে ঢুকালেন ও বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় দিয়ে দুকানের উপরিভাগে মাসহ করলেন। -সহীহ বুঃ মাঃ-৩৬, আঃ দাঃ-৯১৩৫, নাসায়ী- ১/৮৮, ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ বলেছেন।

অনুরূপ আরো সহীহ হাদীস আছে, নাসাই-১০২, ইবনু মাজাহ নায়ল-১/২৪২-২৪৩, মিশকাত- হা/৪১৪।

উযুর শুর"তে বিসমিল-াহ বলে শুর" করতে হবে,- তথাকথিত উযুর নিয়ত বলে কিছু সহীহ ও জাল কোন প্রকার হাদীস বর্ণনা নেই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত- তিনি বলেন, "রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির সালাত হয়না যে সঠিকভাবে উযু করেনা এবং ঐ ব্যক্তির উযু হয়না যে তাতে আল-াহর নাম নেয় না।" -সহীহ আঃ দাঃ-১০১, ইবনু মাযাহ-৩৯৯,৩৯৭, আঃ তীঃ-২৫।

সুতরাং উযুতে বিসমিল-াহ বলে শুর" করা সুন্নাত, প্রথাগত নিয়তের কোন প্রয়োজন নেই, কোন হাদীস প্রমাণও নেই। (সূত্রঃ জাঃ নাঃ, স্বঃ মুঃ, ছাঃ রাঃ, মুঃ মঃ)

জামাতে নামাজ পড়া

জামাতে নামাজ আদায় করা মুসলমান পুর"ষের জন্য ওয়াজিব

হাদীস প্রমাণঃ

১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জামাতে নামাজের আযান শোনে এবং তাতে সাড়া দেয়নি, সে একা নামাজ পড়লে তার নামাজ হবে না যদিনা কোন ওজর বা অপারগতা থাকে"। -সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ-৭৯৩।

২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আমার ইচ্ছে হয় এই নির্দেশ জারি করতে যে, এক ব্যক্তি ইমাম হয়ে নামাজ পড়ানো শুর" কর"ক আর আমি লাকড়ী বহনকারী একদল সাথীসহ ঐসব লোকের ঘর বাড়ীতে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিই, যারা নামাজের জামাতে উপস্থিত হয়না"। -সহীহ সুনান আঃ দাঃ-৫৪৮।

৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "জনৈক অন্ধ ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, হে আল-াহর রাসূল, আমার জন্য এমন কোন পথ চালক নেই যে আমাকে মসজিদে পৌছিয়ে দিতে পারে। এজন্য সে রাসূল (সাঃ) এর নিকট ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি চাইল । তিনি প্রথমে অনুমতি দিলেন । সে চলে যেতে থাকলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি নামাজের (আযানের) আওয়াজ শুনতে পাও, সে বলল হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাকে মসজিদের জামা'তে আসতে হবে।-সহীহ মুসলিম ১৪৮৬।

৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, "রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল এবং অনুসরনের পথে অর্থাৎ জামা'তে নামাজে হাজির হওয়ার ব্যপারে কোন ওজরই প্রতিবন্ধকরূপে না দাঁড়ায়, তার ঘরে পড়া কোন নামাজ কবুল হবে না। প্রকৃত ওজর কি এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন- ভয় কিংবা রোগ। -সহীহ সুনান আঃ দাঃ-৫৫১।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে জামা'তে নামাজ না পড়লে অনেক ক্ষেত্রে নামাজ কবুল হবার ব্যপারে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে এবং এ ব্যপারে নবী (সাঃ) যেমন অন্ধকেও মাফ করেননি, তেমনি ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার মত ক্রোধও প্রকাশ করেছেন।

জামাতে নামাজের মর্যাদা ও ফযীলতঃ

১) হযরত আব্দুল-াহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন জামাতের সাথে নামাজ একাকী নামাজ অপেক্ষা সাতাশ গুন বেশী উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন। -সহীহ আল-বুখারী ৬৪৫।

২) হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতে পড়েছে, সে যেন অর্ধরাত্রি ধরে নামাজ পড়েছে। এরপর যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন পূর্ণ রাত্রিই নামাজ পড়েছে। অর্থাৎ সারারাত জেগে থেকে নফল নামাজ পড়লে যে সওয়াব বা ফজীলত লাভ করা যায়, সেই সওয়াব বা ফজীলত লাভ হয় এশার নামাজ ও ফজরের নামাজ জামাতে পড়লে। -সহীহ মুসলিম ১৪৯১।

৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি আল-াহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য একাধারে চলি-শ দিন তাকবীরে উলার সাথে (জামাতের প্রথম তাকবীর) জামাতে নামাজ আদায় করতে পারলে তাকে দু'টি মুক্তিসনদ দেওয়া হবে। এক, জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি, দুই, মুনাফিকী থেকে নিষ্কৃতি। -সহীহ তিরমিযী ২৪১।

রফউল ইয়াদাইন করা ও সালাত শুর" করা

হাদীস প্রমাণঃ

১) নিয়ত অর্থ "সংকল্প"।

সালাতের শুর"তে নিয়ত করা অপরিহার্য অর্থাৎ ওযু করে পবিত্র হয়ে, কাবামুখী হয়ে, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পোশাক ও দেহমন নিয়ে সালাত পড়বেন তার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে বিনম্র চিত্তে সালাত শুর" করবেন। তথাকথিত "নাওয়াইতু আন ---" নিয়তনামা এবং জায়নামাজের দো'আ মনে করে "ইন্নী ওয়াজ্জাহাতু ---" পড়ার কোন সহীহ ভিত্তি নেই, বরং যেহেতু নবী (সাঃ), সাহাবাগন, তাবে-তাবেঈগণ এবং সর্বোপরি চার ঈমাম থেকে তা প্রমানিত নয়। সুতরাং তা বিদ'আত। [সূত্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃরাঃ) মুঃ আসাদুল-াহ আল গালিব পৃষ্টা-৮৩, দুয়ায়ে মুখতার ১/৩৬,৩৭, ফাত হুল ক্বাদীর ১/৩৮৬, কাবীরী ২৫২পৃঃ, ছিফাতু ছালাতিন নবী (সাঃ)- আশ-শায়েখ মুঃ নাছির উদ্দিন আলবানী (রাঃ) - পৃষ্টা-১০৪(রাসূল (সাঃ) এর জামা'তে নামাজ), সুঃ আঃ দাঃ(১ম খ"), তাহক্বীক্ব আল-ামা নাসির"দ্দীন আলবানী (রঃ), পৃঃ ৪৬৪]

২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন, নামাজের চাবি হল পবিত্রতা, তার তাহরীম হল শুর"তে "আল-াহু আকবর" বলা, তার তাহলীল (শেষ) হল সালাম বলা। যে ব্যক্তি আলহামদুলিল-াহ (সূরা ফাতিহা) ও অন্য সূরা পাঠ করেনি তার নামাজ হয়নি, চাই তা ফরজ নামাজ হোক বা সুন্নাত নামাজ। -সহীহ আঃ তিঃ ২৩৮, ইবনু মাজাহ (২৭৫-২৭৬)।

৩) রাসুলুল-াহ (সাঃ) যখন নামাজে দাড়াতেন, দুই হাত কাঁধ বরাবর উচু করতেন অতঃপর "আল-াহু আকবার" বলে তাকবীর তাহরীমা করতেন।--- সহীহ। মুসলিম-৭৬০, আনরূপ হাদীস ৭৬১, ৭৫৯, ৭৫৮। অনুরূপ হাদীস সুনান আবু দাউদ (তাহকীক)-৭২১,৭২২, অনুরূপ হাদীস সহিহুল বুঃ ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭।

নবী (সাঃ) তাকবীরে তাহরীমা "আল-াহু আকবর" বলে দুহাত উত্তোলন করে সালাত আরম্ভ করতেন। এর প্রথমে কোন " নাওয়াইতু আন ---" নিয়তনামা পাঠ করতেন না। এ ব্যপারে কোন জাল যইফ, দুর্বল হাদিসেও কোন হাদীস বইয়ে এ ধরনের নিয়তের উলে-খ নেই।

হানাফী ফিক্বাহ বই দুররে মুখতারে রয়েছে, নিয়তনামা অর্থাৎ "নাওয়াইতু আন ---" পাঠ সম্পর্কে সহীহ হাদীস তো দুরের কথা কোন যইফ হাদীসও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট চারজন ঈমাম এর কোন একজনও নিয়তনামা পাঠ দ্বারা সালাত আরম্ভ করতেন না। সারকথা হচ্ছে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র পড়ে এটাই জানা যায় নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করার বস্ড়ু নয়। নিয়্যাতের নামে মুখে কিছু বিশেষ ধরনের ফরম্যাট করে কিছু বলা সুন্নাতের বিপরীত। কাজেই মুখে নিয়্যাত উচ্চারন করা বিদআত। -দুররে মুখতার-১/৪৯, হিদায়া-১/২২।

সম্ভবত এ কারনে হানাফি ফিকহের কোন গ্রন্থে যেমন হিদায়া, শারহু বিকায়া, কুদুরী, ফাতহুল ক্বাদীর, নুর"ল ইযাহ, দুররে মুখতার , মারাকিল ফারাহু, রদ্দুর মুহতার হাশিয়াহ তাহতাভী প্রভৃতিতে সালাতের নিয়্যাতের কোন শব্দই খুজে পাওয়া যায় না। (সালাতে মুস্ড়ফা)। [সুনান আবু দাউদ (১ম খ") তাহক্বীক্ব আল-ামা নাসির"দ্দীন আলবানী(রঃ), আলোচনা পৃঃ ৪৬৪]

৫) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) তাকবীর (আল-াহু আকবর" বলে নামাজ শুর" করতেন এবং সূরা ফাতিহা দিয়ে কিরাত পাঠ শুর" করতেন ---- (আরো বিস্ড়ৃত) -সহীহ মুসলিম ১০০২। অনুরূপ আরো সহীহ হাদীস - ইবনে মাজাহ-হা/৮০৩, ৩৮০৪।

মোল-া আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ), আব্দুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ), আল-ামা আব্দুল হুমাম হানাফী (রাঃ)সহ আরো হানাফি আলেমগন এ ব্যপারে এক বাক্যে বলেছেন যেহেতু নবী (সাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সনদে, কিংবা দুর্বল সনদে এর"প (নিয়্যত নামা) কখনো বর্ণিত হয়নি এবং কোন সাহাবী বা তাবেঈ বা চার ঈমামও এরূপ (নিয়্যতনামা) পড়াকে পছন্দ করেননি, সুতরাং মুখে নিয়্যত পাঠের প্রচলিত রেওয়াজটি দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি অর্থাৎ বিদআত।--- [আঃ দাঃ- আলোচনা ৪৬৩, ৪৬৪ পৃঃ, ছাঃ রাঃ-৮৩ পৃঃ, ইগাসাতুল লুহফান-১/৩৬, যাদুল মা'আদ-১/৫১]

জায়নামাজের দোয়া বলে কিছু না থাকার ব্যাপারে হাদীস প্রমাণঃ

আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সাঃ) সালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন, "ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল-াজি ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ----" এ বড় হাদীসটিতে এরপর আরো বেশ কিছু দোয়া পড়ার কথা লেখা আছে। [সহীহ সুনান আঃ দাঃ-৭৬০, তিঃ (অধ্যায়-দাওয়াত, হা/৩৪২১), মুসলিম(অধ্যায়- রাতের সালাতে দু'আ-৭৭১, অনুরূপ সহীহ হাদীস তিরমিযী-

২৬৬, ৩৪২২, ৩৪২৩, নাসায়ী-৮৯৭, আঃ দাঃ-১৫০৯, ইবনু মাজাহ-৮৬৪,১০৫৪, আহমাদ-৮০৫,৯৬৩, দারেমী-১২৩৮,১৩১৪]

এই সহীহ হাদীস যা সর্বজনসম্মত ভাবে সহীহ দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাতে দেখা যাচ্ছে তথাকথিত জায়নামাজের দোয়া নবী (সাঃ) পড়েছিলেন মাঝে মাঝে তাকবীর তাহরীমা (আল-াহু আকবর) বলে হাত বাধার পরে। এর বিপরীতে কোন জাল হাদীসও এর ূপ আমলের সমর্থনে পাওয়া যায় নি।

[সুতরাং, মুখে নির্দিষ্ট ফরম্যাট বানিয়ে নিয়ত বা জায়নামাজের দোয়াকে সালাতের শুর ুতে এর অংশ বানিয়ে সালাত শুর ু করার শর্ত হিসেবে যে রেওয়াজ চালু আছে তা বিদআত (অর্থাৎ দ্বীন/ধর্মের মধ্যে নব আবিষ্কৃত সৃষ্টি)]

তাকবীরে তাহরীমার পর হাত কোথায় বাধবেন

হাত বাধার দুটি নিয়মঃ

প্রথম নিয়মঃ ডান হাতের কব্জি বাম হাতের জোড়ের উপর থাকবে।

দ্বিতীয় নিয়মঃ ডান হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাতের কনুই এর উপর থাকবে, অর্থাৎ সমস্ড় ডান হাত বাম হাতের উপর থাকবে, এটাই যিরা'আহ এর উপর যিরা"আহ (হাদীস এর ভাষা)রাখার পদ্ধতি। হাত সবসময় বুকের উপরে বাঁধতে হবে। -সহীহ বুঃ (১ম খ ঁ) পৃঃ ৩৫৮, আঃ দাঃ-পৃঃ ৫০৬,৫০৭, বুঃ মাঃ-পৃঃ ১৮০, ১৮১।

হাদীস প্রমাণঃ

১) বিখ্যাত তাবেঈ ত্বাউস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ (সাঃ) সালাত আদায়কালে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপর বাঁধতেন। -সহীহ আঃ দাঃ- ৭৫৯।

২) সাহল ইবনু সা'দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল-াহ (সাঃ) এর যুগে লোকদের নির্দেশ দেওয়া হত, প্রত্যেকে সালাতে ডান হাত বাম হাতের যিরার উপর রাখবে।

[হাদীসের আরবী ইবারতে (যিরা) শব্দের অর্থ "কনুই থেকে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ড়", সহীহ বুঃ-৭৪০]

৩) হুলব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) কে সালাত শেষে ডান এবং বাম দিকে ফিরতে ও সালাতে বুকের উপর হাত বাঁধতে দেখেছি। -সহীহ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৮৬৪।

৪) ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত-তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) এর সাথে সালাত আদায় করেছি, তিনি (সাঃ) তার ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর হাত বাঁধতেন। -সহীহ তাহক্বীক্ব ইবনু খুযাইমাহ-৪৭৯, বুঃ মাঃ-হা/২৭৫।

৫) ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি অবশ্যই রাসুল (সাঃ) এর সালাতের দিকে লক্ষ্য রাখতাম, তিনি কিভাবে সালাত আদায় করতেন। তিনি সালাতে দাঁড়াতেন অতঃপর তাকবীর দিতেন এবং কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন , অতঃপর ডান হাত বাম হাতের পাতা কব্জি ও বাহুর উপর রাখতেন। -সহীহ নাসাঈ-৮৮৯, আঃ দাঃ-(ভারতীয় ছাপা) ৭২৭, আহমাদ-১৮৮৯০, সহীহ ইবনু খুজাইমাহ-৪৮০, ইবনু হিব্বান-হা/১৮৬০।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ ২ নং হাদিসের ক্ষেত্রে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও আধুনিক প্রকাশনীর বুখারী শরীফে 'যিরা' অর্থ কব্জি বলা হয়েছে, আবার একই শব্দের অন্যত্র অর্থ করা হয়েছে 'বাহু'। সব হাদীস গ্রন্থে 'যিরা' অর্থ বাহু করা হয়েছে। যেমন রাসূল (সাঃ) ওযু করার সময় মূখমন্ডল ধৌত করার পর 'যিরার' উপর পানি ঢালতেন। -সহীহ মুসলিম -১৫৯৭, 'মসজিদ' অধ্যায় অনু-৫৬, ১/২৪০-২৪১, মিশকাত-৩৯২২, মুঃ আহমাদ-১০০৮) এছাড়া আরবী কোন অভিধানে 'যিরা' শব্দের অর্থ কব্জি করা হয়নি।

৫নং হাদীসের ক্ষেত্রে- "মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে" বইটিতে উক্ত হাদীসটির পূর্ণ অর্থ করা হয়নি, বরং অর্থ গোপন করা হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় ছাপা আবু দাউদে অর্থ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে দুটি শব্দ ভুল হরকত দেওয়া হয়েছে। [সুত্র- জাল হাদিসের কবলে- রাসূলাল-াহ (সাঃ) এর সালাত- মুঃ মঃ পৃঃ২২০-২২১, আঃ দাঃ পৃঃ৫০৭, সহীহ বুঃ ৩৫৭-৩৫৯ পৃ:]

নাভীর নিচে হাত বাঁধার কোন সহীহ হাদীস নেইঃ

১) আবু জুহায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আলী (রাঃ) বলেছেন, সুন্নাত হল সালাতের মধ্যে নাভীর নিচে হাতের পাতার উপর হাতের পাতা রাখা।

-দুর্বল আঃ দাঃ-৭৫৬, যঈফ(তাহক্বীক্ব আলবানী আঃ দাঃ), উক্ত সনদে আব্দুর রহমান নামে একজন রাবী আছেন, যিনি সকল মুহাদ্দিসের ঐক্যমতে যঈফ(তানক্বীহ পৃঃ ২৮৪, মুঃ মুসলিম-২১৪)।

২) আবু হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে অনুরূপ হাদীস দুর্বল। আবু দাউদ-৭৫৮, ঈমাম আবু দাউদ(রাঃ) বলেন আমি শুনেছি, ঈমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাঃ) সনদের আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক আল কুফীকে দুর্বল বর্ণনা কারী বলেছেন।

১নং ও ২নং হাদীসের সনদে আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক কে এছাড়াও ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী, ইমাম আবু হাতিম, ইমাম নাবাবী প্রমূখ সবাই যঈফ বলেছেন। (নাসবুর রায়াহ-১/৩১৪, আঃ দাঃ-পৃঃ ৫০৬,)

৩) অনুরূপ হাদীস, ইবনু আবু শায়বার রিওয়ায়েতে তদীয় মূসান্নাফে যঈফ আল-ামা মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধী হানাফী স্বীয় "ফতহুল গফুর" গ্রন্থে লিখেছেন, "তাহতাস সুররাহ" (নাভীর নিচে) শব্দটি ইবনু আবু শায়বাহর আসল কিতাবে নেই। আল-ামা নায়মুবী হানাফী বলেন, যদিও কোন কোন নুসখাতে এই অংশটুকু পরিলক্ষিত হয়েছে তথাপি ইহা অসংরক্ষিত এবং এবং সিকাহ রাফীদের বিপরীত বর্ণনা। (ই'লাউস সুনান) [আঃ দাঃ-পৃঃ ৫০৭]

৪) আনাস (রাঃ) থেকে আরেকটু বিস্তৃত অনুরূপ হাদীস। জাল ও যঈফ তানক্বীহ (পৃঃ ২৮৫), তুহফাতুল আওয়াযী-১/২১৫, ইমাম ইবনু হাযম, আল মুহাল-া-৪/১৫৭, তানক্বীহ পৃঃ ২৮৫।

৫) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) সূত্রে অনুরূপ হাদীসটিও জাল ও যঈফ, তানক্বীহ পৃঃ ২৮৫, তুহফাতুল আওয়াযী-১/২১৫ তুহফাতুল আওয়াযী-১/২১৪।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রখ্যাত হানাফী আলেমগনের ভাষ্য, সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেম শায়খ সালিহ আল উসাইমিন (রাঃ), সৌদি আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আযীয

বিন বায (রাঃ) সহ প্রমুখের এ ব্যাপারে দৃঢ় ভাষ্য রয়েছে এবং সবাই একমত যে সালাতে বুকের উপরে হাত বাধাটি শুদ্ধ পদ্ধতি। [আঃ দাঃ পৃঃ ৫০৬-৫০৮, সহীহ বুঃ পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯, বুঃ মাঃ পৃঃ ১৮০-১৮২]

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়াঃ

ইমাম ও মুক্তদী সকলের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। কারণ কেউ সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাত হয় না ।

হাদীস প্রমাণঃ

১) উবাদাহ ইবনু সমিত (রাঃ) হতে বর্ণিত যে রাসুলুল-াহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা আল ফাতিহা পড়লনা তার সালাত হলনা।

[যুযউল কিরআতঃ হা-২, সহীহ বুঃ ৭৫৬, মুসলিমঃ পৃঃ১/১৬৯, মুসলিমঃ হা/৯০০, ৯০১,৯০২,৯০৪,৯০৬,৯০৭, মিশকাত-পৃঃ ৭৮, হা/৮২২,৮২৩, বঙ্গানুবাদ মিশকাত-হা/৭৬৫,৭৬৬,২/২৭২, পৃঃ সালাতে কিরাত পাঠ অনুচ্ছেদ।]

২) ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস উলে-খ করার পূর্বে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ নির্ধারন করেন,প্রত্যেক সালাতে ইমাম ও মুক্তদী উভয়ের জন্য কিরআত (সূরা ফাতিহা)পড়া ওয়াজিব তা মুকীম অবস্থায় বা সফর অবস্থায় হোক,যেহরী সালাত(সরব সালাত) বা সেরী(নিরব সালাত) সালাত হোক। (সহীহ বুঃ ১/১০৪পৃঃ হা-৭৫৬,মুঃ মঃ-পৃঃ ২৩৭)।

উলে-খ্য যে উক্ত হাদীস পেশ করে অপব্যখ্যা দেয়া হয় যে,এই হাদীস একাকি সালাতের জন্য। অথচ উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ জামাতে সালাত আদায়ের সময় যোহর আসর ও মাগরিবের শেষ রাকাত ও এশার দুই রাকাতেও কি সূরা ফাতিহা পড়া যায় না? কারণ মুক্তদী তো একাকি নয়, ইমামের সাথে আছে। অথচ যোহর ও আসরের সালাতে মুক্তদীরা সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরাও পাঠ করতে পারবে মর্মে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। -ইবনু মাজাহ-হা/৮৪৩,পৃঃ ৬১, সনদ সহীহ, আলবানী ইরওয়াউল গালীল- হা/৫০৬, মুঃ মঃ-পৃঃ২৩৮।

২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল-াহর রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল কিন্তু সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলনা, তার সালাত বৈধ হল না। একথাটি আল-াহর রাসূল (সাঃ) তিন বার উচ্চারন করলেন। তখন আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি? উত্তরে তিনি বললেন চুপে চুপে পড়। ----- (আরো বিস্ড়ত হাদীস) [সহীহ জুযউল ক্বিরআতঃ১১, সহীহ মুসলিম-৩৯৫]

অনুরূপ আরো কিছু হাদীস যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [সুনান ইবনে মাজাহ-৮৪০, আহমাদ ২৭৫৬, হা/২৬৮৮৮, যুযউল ক্বিরআত-১৪, ইবনে মাজাহ-৮৪১]

(আল বায়হাক্বি, পৃঃ ৫০, হা/১০০) (সহীহ মুসলিম-৩৯৬, যুযউল ক্বিরআত-১৫৩) (যুযউল ক্বিরআত-১৩, সহীহ বুঃ-৭৭২, সহীহ মুসলিম-৩৯৬)

৩) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) একদা তার সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। যখন সালাত শেষ করলেন, তখন তাদের দিকে মুখ করলেন, অতঃপর বললেন, ইমাম ক্বিরআত করা অবস্থায় তোমরা কি তোমাদের সালাতে ইমামের পিছনে

ক্বিরআত পাঠ কর? তারা চুপ থাকলেন। তিনবার এভাবে জিজ্ঞেস করার পর একজন/ সকলে বললেন আমরা পাঠ করেছি। তখন তিনি বললেন তোমরা এমনটি করোনা, নিরবে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আলবানী বলেন হাদীসটির সনদ সহীহ লিগায়রিহী। [সহীহ ইবনে হিব্বান ১৮৪১। তাহক্বীক্ব আলবানী মুসনাদে আবী ইয়ালা ২৮০৫]

৪) ইয়াযিদ ইবনু শরীফ একদা ওমর (রাঃ) কে ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে তিনি বললেন, তুমি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আমি বললাম যদি আপনি ইমাম হোন? তিনি বললেন, যদিও আমি ইমাম হই। আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বিরআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্বিরআত পাঠ করি। [সহীহ বাইহাক্বী, সুনান কুবরা- ৩৩৪৭, সনদ সহীহ, সিলসিলা যয়ীফাহ-৯৯২ এর আলোচনা দ্রঃ] অনুরূপ সহীহ হাদীস- ইবনে মাযাহ- ৮৩৭,৮৩৮,৮৩৯,৮৪০,৮৪১,৮৪২]

শ্রদ্ধেয় ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেছেন, ইমামের পিছনে যেহরী সালাত (যেসব সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরআত পড়েন) চুপে চুপে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, নতুবা সালাত সম্পূর্ণ হবে না- এইমর্মে বিভিন্ন সাহাবী, তাবে-তাবেঈন এবং নবী (সাঃ) থেকে সরাসরি সাব্যস্ড় ৬০ টিরও ও বেশি হাদীস একত্রিত করে তার বিখ্যাত বই "যুযউল ক্বিরআত" লিখেছেন। [সূত্রঃ বাংলা অনুবাদ- তাহক্বীক্ব যুযউল ক্বিরআত, ইমাম বুখারী (রাঃ), তাওহীদ পাবলিকেসন্স]

যোহর ও আসর সালাতে মুক্তদীরা সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরাও পড়তে পারেঃ

হাদীস প্রমাণঃ

জাবের ইবনু আব্দুল-াহ (রাঃ)বলেন, আমরা যোহর ও আসর সালাতে প্রথম দুই রাকা'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করতাম। [সহীহ ইবনু মাজাহ-৮৪৩, পৃঃ৬১, সনদ সহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল-৮০৬]

বিঃদ্রঃ যোহর ও আসরের সালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয় ইমামের আগেই যদি মুক্তদীর ক্বিরআত পড়া হয় তাহলে ইমামের অনুসরন করা হবে না। তাছাড়া "মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে" বইয়ে কোন প্রমাণ ছড়াই জোরপূর্বক হাদীসের দুইটি শব্দ সম্মন্ধে বলা হয়েছে যে, যদি ইমাম উচ্চ আওয়াজে ক্বিরআত পড়ে তবে মুক্তদীর কর্তব্য হচ্ছে মনোযোগের সাথে উক্ত কিরাত শ্রবন করা। আর দ্বিতীয় শব্দ "নীরব থাকবে" বলার দ্বারা প্রমানিত হয় যে ইমাম যদি নিম্ন আওয়াজে কিরাত পড়ে তাহলে মুক্তদীগন নীরব থাকবে কিছু পড়বেনা।

সহজেই অনুমেয়, যেখনে শর্ত করা হয়েছে কুরআন তেলাওআত করা হলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে।সেখানে কিভাবে যোহর এবং আসরের সালাত অন্ড়র্ভূক্ত হল? এক্ষেত্রে অপব্যখ্যা করা হয়েছে। অথচ যোহর ও আসরের সালাতে মুক্তদীরা সূরা ফাতিহা তো পড়বেই সাথে অন্য সূরাও পড়তে পারবে এইমর্মে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আর ইমামের অনুসরন না হওয়ার ব্যখ্যাও অযৌক্তিক। কারণ র"কু সিজদাহ, তাশাহুদ, দরূদ দু'আ মাছুরা সবই ইমাম-মুক্তদী উভয়ে প্রত্যকে আলাদা আলাদা সালাতে

পড়ে থাকে। সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই যে ইমাম আগে না মুক্তদী আগে, শুধুমাত্র সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে কেন প্রশ্ন? [সূত্রঃ মুঃ মঃ পৃঃ ২৪১-২৪২]

[সুতরাং যেহরী (ইমাম জোরে ক্বিরআত পড়ে) ও সেরী (যেখানে ইমাম নীরবে ক্বিরআত পড়ে) সালাত কখনোই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবেনা কথার কোন সহীহ হাদীস বা দলীল নেই।]

শুধু জেহরী (যেখানে ইমাম জোরে ক্বিরআত পড়েন) সালাতে মুক্তদীরা সূরা ফাতিহা পড়বেনা এবং সেরী (যেখানে ইমাম নীরবে ক্বিরআত পড়েন) সালাতে মুক্তদীরা সূরা ফাতিহা পড়বেন।– এ মাসয়ালার পর্যালোচনা।

- এ ব্যপারে দলিলগুলো হল-

১। "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে শোন এবং চুপ থাক" (সূরা আরাফ, ২০৪ আয়াত)।

২। "রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "অনুসরন করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়"। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলেন তখন তোমরা তাকবীর বল। আর যখন কিরআত পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন তিনি বলেন "গাইর্ল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালদ্দাল-ীন" তখন তোমরা বলবে আমীন। (আরো বিস্ড়ত ---)। -সহীহ, সুনান ইবনে মাজাহ-কিতাবুসসালাত, ৮৪৬।

যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে , তখন ইমামের ক্বিরআতই মুক্তদীর ক্বিরআত বলে গন্য হবে। [বায়হাক্বী]

পর্যালোচনাঃ

এ হাদীসটি যইফ। যদি সহীহ ধরে নেওয়া হয় (তর্কের খাতিরে) তবু এর মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের সম্পর্কিত হাদীসের বিরোধীতা নেই। এই হাদীসটি আম (ব্যাপকার্থক) এবং সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কিত হাদীস খাস (সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক)। 'আম' ও 'খাস' এর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই, দুইটি হাদীসকে একত্রিত করে একথা বলা যায় যে, মুক্তদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা সবসময় জর্রী, অবশ্য অন্য সূরা পাঠ করা জর্রী নয়। এক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরআত মুক্তদীর ক্বিরআত বলে গণ্য হবে।

ইমামের চুপ থাকার স্থানে মুক্তদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা উচিত এবং অন্য সূরা যখন ইমাম জেহরী (সরব) পাঠ করবে তখন মুক্তদী চুপ থাকবে। দ্বিতীয় সূরাটি ইমাম চুপ থাকার স্থানেও পাঠ করবেনা। এক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরআতই মুক্তদীর ক্বির আত হিসাবে গণ্য হবে। তবে ইমাম যখন সেরী (নিরবে) সালাতে ক্বির আত করে তখন মুক্তদী সূরা ফাতিহার সাথে দ্বিতীয় কোন সূরা (যেখানে প্রযোজ্য, যেমন চার রাকাতের সালাতের প্রথম দুই রাকা'আতে) পাঠ করতে পারবে চুপে চুপে। -কামাল আহমদ, পৃঃ ৯-১০।

পূর্বেই উলে-খিত অসংখ্য হাদীস যেখানে মুক্তদীকে ইমামের পিছনে চুপিসারে সূরা ফাতিহা পড়তে বলা হয়েছে , তার সাথে পরবর্তী হাদীস সমূহ ও সূরা আরাফ এর ২০৪ আয়াতের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে ইমামের সরবে ক্বিরাতে মুক্তাদী চুপ করে শুনবে শুধু সূরা ফাতিহা ছাড়া।

যেমন- নিচের হাদীস দুটি রাসূল (সাঃ) মুক্তদীদের বলেছেন- "যখন আমি জেহরী ক্বিরআত করি তখন কুরআনের কিছুই পড়োনা, তবে সূরা ফাতিহা ছাড়া। কেননা যে সূরা ফাতিহা পড়েনা তার সালাত হবেনা। -হাদীসটি হাসান। (আবু দাউদ, দারা কুতনী ১/১২১ পৃঃ, ইমাম বুখারীর যুজউল কিরাত, পৃঃ ১৮) অপরদিকে হাদীস- "যখন ইমাম ক্বিরআত করেন তখন চুপ থাকো" (সহীহ মুসলিম)।

এই দুইএর সমন্বয় যাতে আয়াত ও হাদীস উভয়ই আমল হবে, যদি ইমামের সরবে ক্বিরআতে চুপ থাকার সময় মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়ে নেয়, তা প্রতি আয়াত এর মাঝে বা যেমন মক্কা, মদিনাতে সূরা ফাতিহা এর পরে একটু বিরতি দিয়ে ইমাম পরের সূরা শুরু করেন, এরকম সময়ে মুক্তদী সূরা ফাতিহা পড়ে নিতে পারে। (সূত্র, যুঃ ক্বিঃ, কামাল আহমদ)

এ প্রসঙ্গে দলিলঃ

(১) সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, নিশ্চই রাসূল (সাঃ) দুইটি স্থানে সাকতা (চুপ) করতেন। একটি হল যখন সালাত শুরু করতেন আর একটি যখন ক্বিরাত সম্পূর্ণ শেষ করতেন। -সহীহ আঃ দাঃ, সহীহ আঃ তিঃ

(২) আব্দুল-াহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন, "সাহাবাগন রাসূল (সাঃ) এর পিছনে ঐ সময় ক্বির আত করতেন যখন তিনি চুপ থাকতেন, পুনরায় নবী (সাঃ) যখন ক্বিরাত পাঠ করতেন তখন সাহাবাগন (রাঃ) কিছুই ক্বিরআত করতেন না। আবার যখন তিনি চুপ থাকতেন তখন তারা পাঠ করতেন"। [সহীহ বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বির আত, পৃঃ ৬৯,৫৫]

যে ইমামের সাথে সালাত আদায় করে তার উচিত ইমাম যখন সাকতা (চুপ) করে তখন প্রথমেই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে"। -বায়হাক্বী কিতাবুল কিরাত, পৃঃ ৫৪।

"ইমামের দুইটি সাকতা রয়েছে তোমরা ঐ সাকতার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাও।" [বুখারী, যুযউল কিরাত, পৃঃ ৬২, সনদ হাসান]

অনুরূপ ঈমাম বুখারী (রাঃ) এর যুযউল ক্বিরাত গ্রন্থের হা/৫৫,৬৪, ৭০,১১,৩১ এবং তিরমিযী ১/১০১ এবং মুসান্নাফে আঃ রাজ্জাকে ২/১৩৩- অনুরূপ হাদীস (সহীহ সনদে) বর্ণিত আছে।

এক্ষেত্রে ইমাম সরবে ক্বিরাআত পাঠের সময় ইমামের নিরব থাকার সময় যেমন সূরা ফাতিহার পূর্বে, অথবা আয়াত সমূহের মধ্যে, বা সূরা ফাতিহার পরে, ঐ সময়গুলোতে মুক্তদীরা সূরা ফাতিহা পড়ে নেবে চুপে চুপে। আর নিরব সালাতের জামাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বে চুপিসারে। [সম্পূর্ণ পর্যালোচনা- কামাল আহমদ, পৃঃ ১১-১৬]

[বিঃদ্রঃ- বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন সাহাবা ও তাবেঈদের ও প্রখ্যাত আলেমগনের এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা ও হাদীস সমূহ সহীহ ভাবে প্রয়োগের যৌক্তিকতা জানতে চাইলে পড়ুন "সহীহ আবু দাউদ, আলোচনা ৫৪৪-৫৭২পৃঃ"।]

[নোটঃ মক্কা ও মদীনায় যাদের নামাজ আদায় করার সৌভাগ্য হয়েছে তারা খেয়াল করবেন ইমামসাহেবগন সূরা ফাতিহার প্রত্যেকটি আয়াত থেমে থেমে পড়েন এবং ফাতিহা পড়ার পর ১-২ মিনিট চুপ থাকেন পরবর্তী আয়াত শুরু করার আগে। এছাড়াও সূরা

ফাতিহা পড়তে হবে প্রতি আয়াত এর মধ্য বিরতি দিয়ে। এ প্রসঙ্গে উম্মু সালামাহ (রাঃ) এর বর্ণনায় দুই টি হাদীস(তিরমীযি,হা/২৯২৭, আবু দাউদ হা/৪০০১-সহীহ) আর আনাস(রাঃ) এর বর্ণনায় একটি হাদীস (বুখারী হা/৫০৪৬) এ আছে- রাসুল (সাঃ) এর কিরাত ছিল, বিসমিল-াহির রাহমানির রাহিম পড়ে থামতেন। আলহামদুলিল-াহি রাব্বিল আলামিন পড়ে থামতেন। আর রাহমানির রাহিম পড়ে থামতেন।মালিকি ইয়াওমিদ্দিন পড়ে থামতেন। এভাবে তাঁর কিরাত ছিল প্রতিটি আয়াত পড়ে বিরতি দিয়ে দিয়ে। ইমাম যদি রাসুল(সাঃ) এর নিয়মে কিরাত পড়েন তাহলে প্রতিটি আয়াত এর বিরতিতে মুক্তাদীও সূরা ফাতিহার আয়াতটি পড়ে নিতে পারেন সহজেই আর ইমাম আর মুক্তাদি উভয়েই সুন্নাত অনুসরন করতে পারেন। আল-াহ আমাদের সবাইকে সঠিক সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার জন্য নিজস্ব অহমবোধ দূরে ঠেলে সঠিক জ্ঞান হাসিল করার তওফিক দিন।]

সরব বা যেহরী জামাতের নামাজে জোরে আমিন বলা

১। ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে "গাইরল- মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালা--ল-ীন" পাঠ করতে এবং "আমীন" বলতে শুনেছি। আমীন বলতে গিয়ে তিনি নিজের কণ্ঠস্বর দীর্ঘ ও উচ্চ করলেন। -সহীহ তিরমিযী ২৪৮, ইবনে মাজাহ ৮৫৫, আবু দাউদ ৯৩২,৯৩৩, নাসায়ী ৯৩২, আহমদ ১৮৩৬২।

২। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল-াহর রাসূল (সাঃ) যখন উম্মুল কুরআন বা সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করতেন তখন তার কণ্ঠস্বর উচু করে "আমীন" বলতেন। -সহীহ দারাকুতনী (১/৩৩৫), হাকিম(১/২২৩), বুলুগুল মারাম ২৮৩।

৩) আত্বা (রাঃ) বলেন, "আমিন" হল দুআ। তিনি আরো বলেন "আব্দুল-াহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) ও তার পিছনের মুসলি-গন এমনভাবে "আমীন" বলতেন যে গুমগুম আওয়াজ হত। আবু হুরায়রা (রাঃ) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে "আমীন" বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেননা। নাফি (রাঃ) বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) কখনোই আমীন বলা ছাড়তেননা এবং তিনি তাদের আমীন বলার জন্য উৎসাহিত করতেন। -সহীহ বুখারী ৭৭৯, ইবনে মাজাহ ৮৫৩।

৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরাও "আমীন" বলো। কেননা যার আমীন বলা ও মালাইকার আমীন বলা এক হয় তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। ইবনু শিহাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ও আমীন বলতেন। [সহীহ বুখারী ৭৮০,৭৮২, মুসলিম ৪/১৮, হা ৪১০। আহমাদ ৮২৪৭, ইবনু মাজাহ ৮৫১,৮৫২]

[অনুরূপ হাদীস যা সহীহ ও হাসান সনদে বর্ণিত আছে, বায়হাক্বী ২য়, ৫৮পৃঃ, সহীহ ইবনে হিব্বান ৪র্থঃ ১৪৬পৃঃ, কাঞ্জুল আম্মাল ১মঃ ২১০পৃঃ, আবু আওয়ানা ১মঃ ১২৭পৃঃ]

সূত্রঃ নামাজে "আমীন" উচ্চস্বরে বলতে হবে, প্রমাণস্বরূপ ৩৯টি দলিল। মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী। অনুরূপ হাদীস আরো আছে , ইবনে মাজাহ ৮৫৪,৮৫৫,৮৫৬,৮৫৭।

জ্ঞাতব্যঃ অনেকে দাবী করেন উক্ত হাদীস গুলোতে "আমীন" জোরে বলার কথা নেই। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে, "যখন ইমাম আমিন বলবে তখন তোমরা আমিন বলবে"। তাহলে ইমাম আমীন জোরে না বললে মুক্তদীরা কিভাবে বুঝতে পারবে এবং কখন আমীন বলবে? তাছাড়া মুসল-ীদের আমিনের সাথে ফেরেশ্তাদের আমিন কিভাবে মিলবে? অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

(১) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমরা "সালাম" ও "আমীন" বলবে। কারণ এ দুটি কারণে ইহুদীরা তোমাদের সাথে সবচেয়ে বেশি শত্র-তা করে। -সহীহ আহমদ, ইবনু মাজাহ ৮৫৬, সিলসিলা সহীহা ৬৯১।

(২) আব্বাস ইবনে ওয়ালিদ খাল-াল দিমাশকী (রাঃ) -ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেন, ইয়াহুদীরা তোমাদের "আমীন" বলার উপর যত বেশি ঈর্শান্বিত হয় আর কোন জিনিসে তত বেশি ঈর্শান্বিত হয়না। সুতরাং তোমরা"আমীন" বলবে। -ইবনে মাজাহ ৮৫৭।

ইহুদীরা যদি আমীন শুনতে না পায় তাহলে তারা শত্রুতা করবে কিভাবে? অতএব উচ্চস্বরে "আমীন" বলার সুন্নাত গ্রহণ করাই হবে প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব। কিন্তু এত সহীহ হাদীস ও ব্যাখ্যা থাকার পরও শুধু মাত্র মাযহাবী শিক্ষার নামে "হেদায়া" কিতাবে বলা হয়েছে মুক্তদীরা নিম্নস্বরে আমীন বলবে।

জ্ঞাতব্যঃ [সূত্রঃ- মুঃ বিন মহসিন ২৫১-২৫২]

জোরে "আমিন" বলার স্বপক্ষে ১৭টি হাদীস এসেছে।

(রাওয়াতুন নাছিইয়াহ ১/২৭১) যার মধ্যে আমিন আস্ড়ে বলার পক্ষে শু'বা থেকে একটি রিওয়ায়াত আহমাদ ও দারাকুতনীতে এসেছে- "আমীন" বলার সময় রাসূল (সাঃ) এর আওয়াজ নিম্ন হত। একই রিওয়ায়াতে সুফইয়ান সাওরী (রাঃ) থেকে এসেছে, "আমীন" বলার সময় নবী (সাঃ) এর আওয়াজ উচ্চ হত। হাদীস বিশারদগনের নিকট শু'বা থেকে বর্ণিত নিম্নস্বরে "আমীন" বলার হাদীসটি মুযতারাব। যার সনদ ও মতনে নাম ও শব্দগত ভুল থাকার কারনে যঈফ। পক্ষান্ড়রে সুফইয়ান সওরী (রাঃ)থেকে বর্ণিত, সরবে আমীন বলার হাদীসটি এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত হবার কারনে সহীহ। (দারাকুতনী হা/১২৫৬ এর ভাষ্য, রাওয়াতুন নসীয়াহ ১/২৭২, নায়লুল আওত্বার ৩/৭৫) [সহীহুল বুখারী ৩৭৭-৩৭৮ পৃঃ]

এছাড়াও "হযরত ওমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এর উদ্ধৃতিতে এবং ইমাম ইবনে হাযাম সূত্রে আরো দুইটি হাদীসে "আমীন" আস্ড়ে বলার কথা আছে যা ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে ওয়াইনা, ঈমাম আহম্মদ, ইমাম বুখারী, ইমাম দারাকুতনী, হাফেজ ইবনে হামার এর মত জগদ্বিখ্যাত হাদীস বিশারদদের দ্বারা যঈফ বলে প্রমানিত। [আঃ সাঃ কালাবগী পৃঃ ৩-৬]

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী তার বিখ্যাত গুনিয়াতুত তালেবীন গ্রন্থে (পৃঃ১০, আইয়ুবিয়া প্রেস), মুজাদ্দিদে আলাফসানী (রাঃ) আবকার-ল মিনান গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৯), প্রখ্যাত হানাফী আলেম শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাঃ) মাদারিজুন নবুওয়াত গ্রন্থে (পৃঃ ২০১) জেহরী সালাতে উচ্চস্বরে আমীন বলার হাদীস বেশি এবং অতি শুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন। [সূত্রঃ সহীহুল বুখারী, পৃঃ ৩৭৯]

"ক্বিরআত" পড়ার পর "আল-াহু আকবর" (তাকবীর) বলে র"কুতে যাওয়া ও র"কুতে যাওয়ার ক্ষেত্রে "তাকবির" বলার সময় "রফউল ইয়াদাইন" করা অর্থাৎ তাকবীর তাহরীমার মত দুই হাত কাঁধ পর্যন্ড় উঠানো এবং র"কু থেকে সোজা হয়ে দাড়ানোর সময় একইভাবে রফ'উল ইয়াদাইন করা এবং চার রাকাআত নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের তাশাহুদ বৈঠকের পর তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়ানোর সময় আবার রফ'উল ইয়াদাইন করা (দুইহাত তাকবীর তাহরীমার মত দু'কাঁধ বরাবর উঠানো।

হাদীস প্রমাণঃ

(১) আব্দুল-াহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল-াহর রাসূল (সাঃ) কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন তিনি র"কুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনো এইরকম করতেন। আবার যখন র"কু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এমন করতেন এবং "সামিয়াল-াহ হুলিমান হামিদাহ" বলতেন। তবে সাজদাহর সময় এরকম করতেন না। [সহীহ। সহীহুল বুখারী ৭৩৬]

(২) আবু কিলাবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি মালিক ইবনু হুওয়ায়য়িস (রাঃ) কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তার দুই হাত উঠাতেন। আর যখন র"কু করার ইচ্ছা করতেন তখনও তার উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন র"কু থেকে মাথা উঠাতেন তখনো তার উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, আল-াহর রাসূল (সাঃ) এরূপ করেছেন। [সহীহ। সহীহুল বুখারী ৭৩৭, মুসলিম ৪/৯ হাঃ৩৯১, আহমাদ ২০৫৫৮]

(৩) নাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ইবনু উমার (রাঃ) যখন সালাত শুর" করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দুইহাত উঠাতেন এবং যখন র"কু করতেন তখনো দু'হাত উঠাতেন। অতঃপর যখন "সামিয়াল-াহ হুলিমান হামিদাহ" বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন তখনো দু'হাত উঠাতেন। [সহীহ। সহীহুল বুখারী ৭৩৯]

এছড়াও শ্রদ্ধেয় ইমাম বুখারী তাঁর "জুযউ রফ'ইল ইয়াদাইন ফিস সালাত" গ্রন্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে ৬৫টি সহীহ হাদীস বর্ননা করেছেন র"কুতে যাওয়ার এবং র"কু থেকে উঠার সময় রফ"ইল ইয়াদাইন (দুইহাত তাকবীর তাহরীমার মত দু'কাধ বা দু'কান পর্যন্ড় উঠানো) এবং চার রাকাআত সালাতে তৃতীয় রাকাতে উঠে দাড়ানোর সময় রফইল ইয়াদাইন করা প্রসঙ্গে। [জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন ফিস সালাত, ইমাম বুখারী (রাঃ)-তাওহিদ পাবলিকেশন্স]

একটি হিসাব মতে রফ'উল ইয়াদাইন এর হাদীসের রাবী সংখ্যা আশারায়ে মুবাশশেরাহ সহ অন্যুন ৫০ জন সাহাবী (ফিখহুস সুন্নাহ ১/১০৭, ফাতহুল বারী ২/২৫৮) এবং সর্বমোট সহীহ হাদীস ও আসারের সংখ্যা অন্যুন ৪০০। [সহীহুল বুখারী, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭]

এ ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনু হিব্বান, সউদী আরবের গ্রান্ড মুফতি শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বায (রাঃ), আল-ামা নাসির্দ্দিন আলবানী, শায়েখ সালিহ আল উসাইমিন(রাঃ), মোল-া আলী ক্বারী হানাফী (রাঃ), শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী সহ প্রখ্যাত হানাফী আলেমগনের এর পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী বক্তব্য বিস্ড়রিত পড়ুন, সহীহুল বুখারী ৩৫৫-৩৫৬ পৃঃ, সুনান আবু দাউদ ১ম খন্ড ৪৮৯-৫০৪ পৃঃ, ৪৬৯-৪৭৬পৃঃ।

(৪) মুহাম্মদ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আবু হুমায়িদ আস সাঈদী (রাঃ) কে দশ জন সাহাবীর উপস্থিতিতে যাঁদের মধ্যে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) ছিলেন, বলতে শুনেছি, রাসূল (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চেয়ে বেশি অবগত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) সালাতে দাড়ানোর সময় নিজের দুহাত কাঁধ পর্যন্ড় উঠিয়ে আল-াহু আকবর বলে পূর্ণাঙ্গররূপে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এরপর ক্বিরাত পড়ে তাকবীর বলে র্কুতে গমনকালে স্বীয় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ড় উঠাতেন। তারপর র্কুতে গিয়ে দু'হাতের তালু দ্বারা হাটুদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধরে রাকতেন। এরপর র্কু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামিয়াল-াহ হুলিমান হামিদাহ" বলে তিনি স্বীয় দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন ----। অতঃপর যখন দুই রাকাত শেষে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ড় উঠাতেন। ঠিক যেমনটি উঠাতেন সালাত আরম্ভকালে তাকবীর বলে। [সহীহ আবু দাউদ ৭৩০, তরমিযী ৩০৪, ইবনু মাজাহ ১০৬১, দায়িমী ১৩৬৬]

অনুরূপ হাদীস, - আবু দাউদ ৭৩৮,৭৩৯,৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, (সব হাদীস সহীহ) অনুরূপ হাদীস সহীহ মুসলিম ৭৫৯, ৭৬১, ৭৬২]

হানাফী মাযহাবের ফিক্বাহ গ্রন্থ- নুর্ল হিদায়া (পৃঃ ১০২), আয়নুল হিদায়া ১/৩৮৪, ১/৩৮৯, ১/৩৮৬) তে র্কুর আগে ও পরে ও তৃতীয় রাকা'আতের দাড়ানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। [সুনান আবু দাউদ আলোচনা পৃঃ ৪৭৬]

বিভিন্ন পর্যায়ে প্রখ্যাত আলেমগন কতৃক রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস সমূহকে মুতাওয়াতীর হাদীস আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগেই এত অধিক রাবী বর্ননা করেছেন যাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য একত্রিত হওয়া সাধারণত অসম্ভব এমন হাদীসকে মুতাওয়াতীর হাদীস বলে।

বিপরীত হাদীস সমূহঃ

(রফ'উল ইয়াদাইন শুধু প্রথম তাকবীর তাহরিমা ছাড়া আর না করা প্রসঙ্গে)

১। আলক্বামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ইমাম ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর সালাত বর্ননা করবনা বা তা শিক্ষা দেবনা? বর্ননাকারী বলেন অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং তাতে কেবল একবার হাত উত্তোলন করলেন।

[তিরমিযী ২৫৭, নাসাঈ ১০৫৭, আবু দাউদ ৭৪৮,- হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান ও ইমাম হাযাম সহীহ বলেছেন। পক্ষান্ড়রে ইমাম বুখারী , ইমাম আহমাদ, ইমাম নাব্বী, ইমাম শাওকানী (রাঃ) প্রমুখ হাদীসটিকে দুর্বল হাদীস বলেছেন। (আল মাজমু'আহ ফী আহাদীসিল মাওযু'আহ, পৃঃ ২০), ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, রাফ'উল ইয়াদাইন না করার

ব্যাপারে কুফাবাসীর এটাই সবচেয়ে বড় দলিল হলেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলিল (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৪, নায়লুল আওত্বার ৩/১৪)। ইমাম আবু দাউদ তাঁর এই ৭৪৮ নং হাদীসটির টিকায় লিখিছেন এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের সার সংক্ষেপ, উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি সহীহ নয়। [সুনান আবু দাউদ ৪৮৯ ও ৫০০ পৃঃ] অনুরূপ হাদীস ৭৪৯, ৭৫১, ৭৫২ আছে আবু দাউদে, যা সনদ সূত্রে দুর্বল।

আবু দাউদের অনুরূপ আরেকটি সহীহ হাদীস রয়েছে সুফিয়ান (রাঃ) এর সূত্রে ৭৫০ নং হাদীস। -এই হাদীসটি সম্মন্ধে ইমাম বুখারী (রাঃ) ও ইমাম ইবনু হাতেম বলেন একবার হাত উত্তোলন যে কুফাবাসীর আমল তা সুফিয়ান (রাঃ) এর বর্ননায় ফুটে উঠেছে যা অন্য হাদীসের বর্ননায় উলে-খ আছে। তাই এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত। [নাসবুর রাইয়াহ ১/৩৯৬ পৃঃ, মু মহসিন পৃঃ ১৮৯]

ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, " সুফিয়ান আমাদের কাছে ইযাযীদ থেকে হাদীস বর্ননা করেছেন যা পূর্ব্বে শারীক বর্ণিত হাদীসের ন্যায়। কিন্তু "অতঃপর আর করতেন না" একথা বলেন নি। সুফিয়ান বলেন, "পরবর্তিতে কুফায় আমাদের উক্ত কথা বলা হয়েছে"। [মুঃ মহসিন পৃঃ ১৮৮]

অনুরূপ হাদীসঃ

২। বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন দুই কানের নিকটবর্তী পর্যন্ড় দুই হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর তিনি আর এরূপ করতেন না। [ত্বহাবী ১২৪৫, দারাকুতনী ১/২৯৩। বায়হাক্বী ২/৭৬, আবু দাউদ ৭৪৯]

"অতঃপর তিনি আর হাত তুলতেন না" কথাটি উক্ত হাদীসের সাথে পরবর্তিতে সংযোজিত হয়েছে। কারণ মুসলিম বিশ্বের কোথাও এমনটি ঘটেনি। [মুঃ মহসিন ১৮৮]

অনুরূপ এ প্রসঙ্গে আরো ৪/৫ টি হাদীস রয়েছে যা সবই বর্ননা সূত্রে যঈফ অথবা দুর্বল হাদীস। [সুনান আবু দাউদ পৃঃ ৪৯২-৫০০]

[বিঃদ্রঃ এ কথা প্রচলিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) এর সময় যারা নতুন ইমান এনেছিল তারা নাকি পুরাতন আচরনের বশবর্তী হয়ে বগলে পুতুল রাখতেন এবং রাসূল (সাঃ) জানতে পারলে রাফ'উল ইয়াদাইনের নির্দেশ দেন। একথার মাধ্যমে সাহাবীদের ইমানের প্রতি নিতান্ড়ই কটাক্ষ ও অপমান করারই নামান্ড়র।]

সবচেয়ে বড় হাদীসটি ইমাম ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় রাফ'উল ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে। কিন্তু মুহাদ্দীসিনে কিরামের নিকট এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তাঁর শেষ বয়সে বার্ধক্যজনিত কারনে স্মৃতিভ্রম ঘটে, ফলে হতে পারে এ হাদীসটিও এর অন্ড়র্ভুক্ত। কারণ তিনি কয়েকটি বিষয়ে সকল সাহাবীদের বিপরীত কথা বলেছেন।

১। সূরা নাস ও ফালাক কুরআনের অংশ নয় মনে করতেন।

২। র"কুতে তাতবিক বা দু'হাত কে জোর করে হাঁটু দ্বারা চেপে রাখতে বলতেন।

৩। হাত বিছিয়ে সাজদা করা ইত্যাদি।

রাফ'উল ইয়াদাইনের হাদীসগুলো মানসুখ বা হুকুম রহিত হয়ে গেছে বলে তিনটি জাল ও যয়ীফ হাদীস পেশ করা হয়। যা প্রখ্যাত হাদীস বিশারদদের দ্বারা অবৈধ বানোয়াট ও জাল প্রমানিত হয়েছে। যেমন আব্দুল-াহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এর নাম দিয়ে শুধু প্রথম

তাকবীরের পর বাকী রুকুতে রাফ'উল ইয়াদাইন করা পরবর্তীতে রাসূল (সাঃ) বাদ দিয়ে দিয়েছেন মর্মে একটি হাদীস একটি প্রকাশনীর সহীহ বুখারীর একটি হাদীসের টীকাতে উলে- খ করা হয়েছে যা কোন হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়না। উপরন্তু ইবনু যুবাইর (রাঃ) সূত্রে রুকুর আগে ও পরে আর তিন রাকাতের জন্য উঠে দাড়াবার সময় সালাতে রাফ'উল ইয়াদাইনের ব্যাপারে সহীহ হাদীস বিদ্যমান। -(মুছান্নাফ ইবনে শায়বাহ হা/২৪৪৫, সিলসিলাহ যয়ীফাহ হা/৬০৪৪, বুখারী হা/১৬, জুয উল রাফে ইয়াদাইন ফিস সালাত হা/৫৭)

[সূত্রঃ- (নাসবুর রাইয়াহ (ইমাম যায়লায়ী) ৩৯৭-৪০১পৃঃ, ফিখহুস সুন্নাহ ১/১৩৪)-সহীহুল বুখারী আলোচনা পৃঃ ৩৫৭।]

অনুরূপ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে প্রথমে রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করা এবং পরবর্তীতে তা ছেড়ে দেওয়ার হাদীসটি যা নসবুর রাইয়াহ ১/২৯২ পৃঃ ও আল বদরুল মুনীর ৪/৪৮৪ পৃঃ তে পাওয়া যায় তা সম্পুর্ন জাল ও বানোয়াট, ইবনুল যাওসী, ডাঃ তাক্বিউদ্দিন এর মত হাদীস বিশারদরা বলেছেন এরকম আছার কোন মুহাদ্দীসগন সন্ধান পাননি বরং ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে এর বিরোধী বর্ণনাটি প্রমাণিত। -তাহক্বীক মুওয়াত্তা পৃঃ ১৭৯, নাছবুর রাইয়াহ ১/২৯২ পৃঃ।

সুতরাং আপনারাই বিচার করুন সহীহ পদ্ধতি কোনটি গ্রহণ করবেন-সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করবেন নাকি গতবাধা নিয়মে সহীহ হাদীস দারা প্রমানিত নয় জেনেও পালন করে যাবেন।

[বিঃদ্রঃ- রফইল ইয়াদাইন করা আশারায়ে মুবাশশারাহ (স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া দশজন সাহাবী) সহ অন্যুন ৫০ জন সাহাবী থেকে সহীহ হাদীস ও আছারের সংখ্যা অন্যুন ৪০০ দ্বারা প্রমানিত সুন্নত, কিন্তু এ ছাড়াও সালাত হয়ে যাবে, কারণ এটি ফরজ রুকন নয় সালাতের। কিন্তু এত বড় আকারে প্রমাণিত সুন্নাত আপনি কি শুধু লজ্জায় বা মাযহাবি অজুহাতে ছেড়ে দিয়ে এত নেকী হারাবেন?]

নামাজে দৃষ্টি বিভিন্ন জায়গায় রাখা সহীহ নয়। রুকুতে ও কিয়ামে (দাঁড়ানো) সর্বাবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবেঃ

১) রাসুল (সাঃ) হযরত আনাস (রাঃ)কে নামাজ শেখাতে গিয়ে বলেছেন, হে আনাস নামাজে তোমার দৃষ্টিকে সর্বদা সেজদার স্থানের দিকে নিবদ্ধ রাখবে। -সহীহ মিশকাতুল মাছ্বাবীহ ৯৯৬, (সূত্রঃ তাহকীক আলবানী)।

২) রাসূল (সাঃ) বলেন- সালাতের মধ্যে সর্বদা সিজদার স্থানে বা তাঁর কাছাকাছি দৃষ্টি রাখবে। -সহীহ মুস্ত্বদরাক হাকেম ১৭৬১, বায়হাকী সুনানুল কুবরা১০০০৮, ছিফাতু ছালাতুন্নবী পৃঃ ৮৯, ইরাওউয়াল গালিল।

৩) রাসূল (সাঃ)একদা নামাজ শেষ করে বললেন, "হে মুসলিম দল! সেই নামাজীর নামাজ হয়না, যে রুকু ও সিজদায় তাঁর মেরুদন্ড সোজা করে না"। -সিলসিলা সহীহা ২৫৩৬ নং (ইবনু মাজাহ)।

৪) ত্বালহা ইবনু আলী আল হানাফী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আল-াহ তা'আলা ঐ বান্দার সালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে সালাতে র"কু ও সিজদায় পিঠ সোজা করেনা"।

৫) র"কুতে তিনি তাঁর মাথাকেও সোজা রাখতেন। পিঠ থেকে মাথা না নিচু হত না উঁচু। -সহীহ আবু দাউদ, বুখারী যুযউল কিরাত, মুঃ আহমদ ৮০১ (সুত্র-সালাতে মুবাশশির ১৩৯ পৃঃ)।

যদি র"কুতে দুই পায়ের পাতার দিকে তাকাতে হয় তবে পিঠের সাথে মাথা সোজা রাখা অসম্ভব, যা ওয়াজিব। তাই র"কুর সময়ও দৃষ্টি সিজদার দিকে রাখতে হবে। [সূত্রঃ রাসূল (সাঃ) এর জামাতে নামাজ ১০৮ পৃঃ, সালাতে মুবাশশির ১০৮, ১০৯ পৃঃ, ইরওয়াল গালীল ৩৫৪।]

দ্বিতীয় ও শেষ বৈঠকে দৃষ্টি ডান হাতের আঙ্গুলের দিকে রাখতে হয়ঃ

১। হযরত আমের ইবনে আব্দুল-াহ ইবনুল যুবাইর (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) যখন তাশাহুদ পড়তে বসতেন তখন তাঁর বাম হাতের তালু তাঁর বাম উর"র উপর রাখতেন। ডান হাতের তালু ডান উর"র উপর রেখে আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শবর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ইশারায় আঙ্গুল অতিক্রম করত না, (অর্থাৎ আঙ্গুলের দিকে চেয়ে থাকতেন)। -সহীহ সুনান আন-নাসায়ী ১২৭৫।

২) হযরত ওয়ায়ল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ), তাশাহুদ পড়া থেকে শুর" করে শেষ পর্যন্ড় কিংবা শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানো পর্যন্ড় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা সর্বদা ইশারা করতেন। এ সময় দৃষ্টি থাকবে আঙ্গুলের মাথায়। -সহীহ নাসাই ১১৬০।

৩) আব্দুল-াহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, যখন তাশাহুদ বসেন, তখন দু'আ করতেন। তিনি ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মধ্যমা আঙ্গুলের উপরে জড়িয়ে রাখতেন। বাম হাতের পাতা বাম হাটুর উপর রাখতেন। -সহীহ মুসলিম ১৩৩৬, ১৩৩৮, মিশকাত ৯০৮, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮৪৭, হা/৩০৪পৃঃ।

উলে-খ্য যে, অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত আব্দুল-াহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি ডান হাতের তালু ও আঙ্গুলসমুহ গুটিয়ে আরবী তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। -সহীহ মুসলিম ১৩৩৮, মিশকাত ৯০৬।

অতএব উক্ত হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ড় এবং ২য় রাকাতের পরে (চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের) তাশাহুদের বৈঠকে বাম হাত উর" ও হাঁটুর উপর বিছানো থাকবে কিন্তু ডান হাত মধ্যমা দিয়ে অপরাপর আঙ্গুলগুলোকে ধরে মুঠো করে ধরে শুধু শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে হবে এবং পুরো বৈঠকে ডান হাতের আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

বিঃদ্রঃ- আমাদের এখানে যে প্রচলিত নিয়ম আছে যে, "আশহাদু আন-লা ইলাহা" বলতে শাহাদাত আঙ্গুল উঠাতে হবে এবং "ইল-াল-াহু" বলার সাথে নামাতে হবে,-এ

ধরনের মাস'আলা কোন সহীহ হাদীস তো দুরে থাক, কোন জাল, যইফ হাদীসেও বর্ণিত নেই।

অতএব সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে প্রমানিত রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত ফেলে ভিত্তিহীন আমল করবেন কিনা তাঁর বিচারক আপনারাই। [সূত্রঃ রাসূল (সাঃ) এর জামাতে নামাজ, আশ-শায়েখ মুঃ নাসির"দ্দিন আলবানী ১২৮-১৩০ পৃঃ, মুঃ মহসিন ২৭৮-২৮০ পৃঃ, সালাতে মুবাশশির, আব্দুল হামিদ ফাইযী পৃঃ ১২৬-১২৭, আলবানী, মিশকাত হা/৯০৬ এর টীকা দ্রষ্টব্য, আলবানী, ছিফাতু সালাতন্নবী পৃঃ ১৪০, মির'আত ৩/২২৯, আসাদুল-াহ আল গালীব, ছালাতুর রাসূল (সাঃ) ১১৭-১১৮পৃঃ]

র"কু ও সিজদা ধীর স্থিরভাবে পূর্ণতার সাথে আদায় না করলে নামায হবে না

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় শেষে রাসূল (সাঃ) কে সালাম দিল। তিনি সালাম এর জবাব দিয়ে বললেন, তুমি পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তোমার সালাত আদায় হয়নি। এইভাবে তিনি লোকটিকে তিনবার ফিরালেন ও পূনঃ পুনঃ সালাত আদায় করালেন। তখন লোকটি বলল, হে আল-াহর রাসুল (সাঃ) যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরন করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, এরচাইতে সুন্দরভাবে আমি সালাত আদায় করতে জানিনা। অতএব আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (সা:) বলেন, যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর দিবে। অতঃপর কুরআন থেকে যা পাঠ করা সহজ মনে হবে তা পাঠ করবে। তারপর প্রশান্ড়িসহ র"কু করবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। অতঃপর প্রশান্ড়ির সাথে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে প্রশান্ড়িসহ বসবে। প্রত্যেক সালাতে এভাবে করবে। [সহীহ আবু দাউদ ৮৫৬, সহীহ বুখারী ৭৫৭, মিশকাত ৭৯০, ৮০৪।]

[এক্ষেত্রে ভালো করে খেয়াল কর"ন নবী (সাঃ) কিন্তু বলেননি যে তোমার সালাত সুন্দর হয় নি, বরং তিনি বলেছেন তোমার সালাত হয়ইনি যদিও সাহাবা সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করছিল। সুতরাং ধীর স্থির ভাবে র"কু সিজদা সহ সালাত আদায় না করলে সালাত নবীজি(রাঃ) বাতিলই করে দিয়েছেন]

২। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ঐ ব্যক্তি যে সালাত চুরি করে। সাহাবীগন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল-াহর রাসূল (সাঃ) সে কিভাবে সালাত চুরি করে? তিনি বললেন, সে সালাতে র"কু ও সিজদা পূর্ন করে না। -সহীহ মুসনাদে আহমাদ ২২৬৯৫, মিশকাত ৮৮৫।

৩। আবু মাসউদ আল বাদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি র"কু ও সিজদায় পিঠ সোজা করেনা তাঁর সালাত যথেষ্ট নয়। -সহীহ আবু দাউদ ৮৫৫, তিরমিযী ২৬৫, নাসায়ী ১০২৬, ইবনু মাজাহ ৮৭০, মুঃ আহমদ ৪৫৪।

৪। আলী ইবনে ইয়াহিয়াহ (রাঃ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত, ---- বিস্ড়ৃত হাদীস এর সাথে রয়েছে, অতঃপর আল-াহু আকবর বলে এমন ভাবে র"কু করবে যেন তাঁর জোড়াসমূহ স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে। অতএব সামিয়াল-াহুলিমান হামিদাহ বলে স্থির সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পরে আল-াহু আকবর বলে এমনভাবে সিজদাহ করবে যাতে শরীরের

জোড়াসমূহ স্ব স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করে। অতঃপর "আল-াহু আকবর" বলে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং পূনরায় আল-াহু আকবর বলে সেজদাতে যাবে। শরীরের জোড়াসমূহ প্রশান্ড়ি লাভ না করা পর্যন্ড় সাজদাতে অবস্থান করবে। কোন ব্যক্তি এরূপ সালাত আদায় করলেই তাঁর সালাত পরিপূর্নভাবে আদায় হবে।

৫। অনুরূপ অপর হাদীস যা আল বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) সূত্রে সহীহ সনদে বর্ণিত যাতে র"কু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যবর্তী সোজা হয়ে বসা ও র"কুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো এসবের প্রতিটির জন্য সমান সময় ব্যয় করতে বলা হয়েছে নবী (সাঃ) এর সালাতের অনুসরনে। -মুসলিম, নাসায়ী ১৩৩১, দারিমী ১৩৩৪, আহমাদ।

৬। আনাস (রাঃ) থেকে অপর হাদীসে বর্ণিত যে, এগুলি এত দীর্ঘ হত যে, (অর্থাৎ র"কু, সিজদা, দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা, র"কুর পর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো) মুক্তাদীগনের কেউ কেউ ধারনা করত যে, রাসূল (সাঃ) হয়তবা সালাতের কথা ভুলে গেছেন। -সহীহ মুত্তাফাক্ব আলাইহি ইয়ওয়াউল গালীল ৩০৭ পৃঃ।

৭। আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত তিনি রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুষ্পদ জন্তুর মত বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে। -সহীহ নাসায়ী ১১১১, ইবনু মাজাহ ১৪২৯, ইবনু হুযাইমাহ ৬৯২, আবু দাউদ ৮৬২।

৮। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চই কোন মুসলি- ৬০ বছর যাবত সালাত আদায় করছে কিন্তু সালাত কবুল হচ্ছে না। হয়ত সে পূর্নভাবে র"কু করে কিন্তু সিজদা পূর্ন করে না। অথবা পূর্নভাবে সিজদা করে কিন্তু পূর্নভাবে র"কু করে না। -সহীহ মুসান্নাফ ইবনে আবী-শায়বাহ ১৯৬৩, সহীহ তারগীব ৫২৯ সনদ হাসান।

পর্যালোচনাঃ

সুতরাং নামাজে র"কু করতে হবে পিঠ ও মাথা সমান্ড়রালে সোজা রেখে সময় নিয়ে, এরপর সোজা হয়ে দাড়াতে হবে র"কুর সমপরিমান সময়, এরপর সিজদাহ করতে হবে ধীর স্থিরভাবে ও দীর্ঘ সময় নিয়ে এবং দুই সিজদাহর মাঝে পিঠ সোজা করে বসতে হবে সিজদাহর সমপরিমান সময় নিয়ে। নচেৎ নামাজ পরিপূর্ন হবে না এবং এজন্য নবী (সাঃ) বারবার সহীহ হাদীসে সতর্ক করেছেন এবং সাহাবাদেরকে এমনকি পুনঃ পুনঃ একই সালাত সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন।

পর্যালোচনার সূত্রঃ মুঃ মহসিন ২৭৫, ২৭৬পৃঃ, রাসূল (সাঃ) এর জামা'তে নামাজ ১২৪-১২৬, সালাতে মুবাশশির ১০৮-১১০পৃঃ, ছালাতুর রাসূল (সাঃ), মুঃ আসাদুল-াহ আল গালীব ১১২-১১৫পৃঃ।

দুই সিজদার মধ্যবর্তি স্থানে দো'আঃ

১। রাসূল (সাঃ) দুই সেজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে এভাবে দু'আ পড়তেন, "আল-হুম্মা ইগফিরলী ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী ওয়ারফা'নী, ওয়াহদিনী, ওয়া'আফিনী, অয়ারযুক্বনী", - অর্থ, হে আল-াহ আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে বলবান কর, আমার মান মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, আমাকে সুস্থ রাখ ও আমাকে জীবিকা দান করো। - সহীহ তিরমিযী ২৮৪, আবু দাউদ ৮৫০।

২। নবী (সাঃ) দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে বসে বলতেন, "রাব্বী ইগফিরলী, রাব্বী ইগফিরলী" অর্থ- প্রভু আমায় ক্ষমা কর, প্রভু আমাকে ক্ষমা কর। -সহীহ সুনান ইবনু মাজাহ ৮৯৭, মিশকাত ৯০১, নাসাঈ দারেমী।

প্রথম রাকাত শেষে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাড়ানোর পূর্বে এবং তৃতীয় রাকাত শেষে চতুর্থ রাকাতের জন্য দাড়ানোর পূর্বে ক্ষণিক বসা সুন্নাতঃ

১। হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ আল-লাইছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) যখন নামাজের বেজোড় রাকাআতের (অর্থাৎ প্রথম রাকাতের পর দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য কিংবা তৃতীয় রাকাআতের পর চতুর্থ রাকাআতের জন্য) সেজদা থেকে উঠতেন, তখন সোজা হয়ে ক্ষণিক না বসা পর্যন্ড় দাঁড়াতেন না। -সহীহ বুখারী ৮২৩, মিশকাত ৭৯৬, অনুঃ ১০।

২। অনুরূপ আরো সহীহ হাদীস আছে যেমন আবু ক্বিলাবা (রাঃ) সূত্রে অনুরূপ সিজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে একটু বসে তারপর দাড়ানোর কথা উলে- খ আছে। -সহীহ আবু দাউদ ৮৪৩।

সালাতের শেষ বৈঠকে বসার পদ্ধতি

সাল- াতের শেষে তাশাহুদে বসার নিয়ম হলোঃ

১। মুহাম্মদ ইবনু আমর ইবনু আত্বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) এর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসা ছিলেন, তখন আবু হুমাইদ সাঈদী (রাঃ) বলেন, 'যখন দু রাকাআতের পর বসতেন তখন বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকাআতের পরে শেষ তাশাহুদে বসতেন তখন বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্ভের উপর বসতেন।' -সহীহ বুখারী ৮২৮, আবু দাউদ ৯৬৩,৯৬৪।

২। মুহাম্মদ ইবনু আমর আল-আমিরী (রাঃ) এবং আব্বাস অথবা আইয়াশ ইবনু সাহল আস-সাঈদী (রাঃ) সূত্রে, একইভাবে শেষ বৈঠকে নবী (সাঃ) বাম নিতম্ভের উপর বসা ও বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে বসার উলে- খ আছে। -সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৬৪৩,৭০০, বুখারী শরীফের ৮২৮ নং হাদীসটি দশজন সাহাবী কর্তৃক সত্যায়নকৃত, (মুঃ মহসিন ২৭৭পৃঃ) ।

৩। নবী (সাঃ) শেষ বৈঠকে বসার ক্ষেত্রে বাম পা এগিয়ে দিয়ে অর্থাৎ পায়ের নলাকে ডান রানের নিচে রেখে বাম পা খাড়া রেখে কিছুটা বিছিয়ে দিয়ে নিতম্ভের উপর বসতেন। -সহীহ সুঃ আঃ দাউদ ৯৮৮।

সুতরাং আমরা চার রাকাআত নামাজের দ্বিতীয় রাকাআত এর পর ডান পা খাড়া করে ও বাম পায়ের উপর যেভাবে বসি একই নিয়মে চার রাকাআত নামাজের শেষ বৈঠকে এবং দুই রাকাআত নামাজের শেষ বৈঠকে বসার নিয়ম সহীহ সুন্নাত অনুযায়ী একই নয়। আমাদের দেশে মহিলারা নবী (সাঃ) এর সুন্নাত অনুযায়ীই বসে থাকে, যেমন তারা বুকের উপরই হাত বাঁধে। আমরা সহীহ সুন্নাতের ভিত্তিতে পুর ষ ও মহিলাদের নামাজ ভুলভাবে ভাগ করেছি। প্রকৃতপক্ষে এরকম ভেদাভেদ নেই।

সহো সিজদাহ

১। আব্দুল-াহ ইবনু বুহাইনাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন সালাতে আল-াহর রাসূল (সাঃ) দুরাকাআত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসলি-গন তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সালাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তার সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে ভুলে যাওয়া বৈঠকের জন্য তাকবীর বলে বসে বসেই দু'টি সিজদাহ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। মুসলি-গন ও তাঁর সাথে দু'টি সিজদাহ করল। -সহীহ বুখারী ১২২৪, ১২৩০, মুসলিম ৫/১৯, হা/৫৭০, আহমাদ২২৯৮১, তিরমিযী ৩৯১, নাসায়ী ১১৭৭,১১৭৮, আবুদাউদ ১০৩৪, ইবনে মাজাহ ১২০৬, ১২০৭।

২। আব্দুল-াহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত আল-াহর রাসূল (সাঃ) যুহরের সালাত পাঁচ রাকাআত আদায় করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সালাত কি বৃদ্ধি করা হল? তিনি বলেন এই প্রশ্ন কেন? প্রশ্নকারী বললেন, আপনিতো পাঁচ রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পরে দুটি সিজদাহ করলেন। -সহীহ বুখারী ১২২৬।

৩। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল-াহর রাসূল (সাঃ) চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজ দু'রাকাআত আদায় করে সালাত শেষ করলেন। যুল-ইয়াদাইন (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল-াহর রাসূল সালাত কি কম করে দেওয়া হয়েছে, নাকি আপনি ভুলে গেছেন? আল-াহর রাসূল(সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? মুসলি-গন বললেন, হ্যাঁ। তখন আল-াহর রাসূল (সাঃ) দাঁড়িয়ে আরো দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বললেন, পরে সিজদাহ করলেন, স্বাভাবিক সিজদার মত বা তাঁর চেয়ে দীর্ঘ। অতঃপর তিনি মাথা তুললেন। -সহীহ বুখারী ১২২৮, ১২২৯, ইবনু মাজাহ ১২১৪, তিরমিযী ৩৯৮, ৩৯৯, নাসায়ী ১২২৪,১২২৭,১২২৮, আবু দাউদ ১০০৮,১০১৪,১০১৫।

৪। সালামাহ ইবনু আলক্বামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনু সীরীন(রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, সাজদাহ সাহুর পর তাশাহুদ আছে কি? তিনি বলেন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর হাদীসে তা নেই। -সহীহ বুখারী ৫৯৫ পৃঃ, আঃ প্রকাশনীর বুখারী ১১৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বুখারী ১১৫৬।

৫। আবু সাঈদ বুখারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ সালাতে এই বলে সন্দেহ পোষণ করে যে সে তিন রাকাআত আদায় করেছে না চার রাকাআত, তবে সে যেন সন্দেহ পরিত্যাগ করে এবং যার প্রতি নিশ্চিত মনে হবে তাঁর উপর ভিত্তি করে সালাত আদায় করবে। অতঃপর শেষে সালাম ফিরার পূর্বে দু'টো সহো সিজদা করবে। ফলতঃ যদি সে পাঁচ রাকাআত আদায় করে থাকে তাহলে সহো সিজদাহর ফলে তাঁর সালাত জোড়া বানিয়ে দিবে অর্থাৎ ৬ রাকাআত পূর্ন হবে, আর যদি সালাত পূর্ণ হয়ে থাকে তবে সহো সিজদাহ দুইটি শয়তানের জন্য নাক ধুলায় ধুসরিত বা অপমানের কারণ হবে।

-সহীহ মুসলিম ৫৭১, তিরমিযী ৩৯৬, নাসায়ী ১২৩৮, ১২৩৯, আবু দাউদ ১০২৪, ১০২৬, ১০২৯, ইবনু মাজাহ ১২০৪, ১২১০, আহমাদ ১০৬৯৯৮, ১০৯২৭, ১০৯৯০, বুলুগুল মারাম ৩৩৩।

৬। আব্দুল-াহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) সালাত আদায় করলেন।সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হল, হে আল-াহর রাসূল (সাঃ) সালাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন,তা কি? তারা বললেন আপনি তো এরূপ এরূপ সালাত আদায় করলেন। তিনি তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে ক্বিবলামুখী হলেন। আর দু'টি সিজদাহ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন, পরে তিনি আমাদের বললেন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করে ও সে অনুযায়ী সালাত পূর্ন করে। অতঃপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদাহ দেয় ।

সহীহ বুখারীর অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত আছে সালাত পূর্ন করে সালাম ফিরাবে তারপর সহো সিজদাহ করবে। মুসলিমে আছে, নবী (সাঃ) দুটি সহো সিজদাহ করেছেন সালাম ও কথা বলার পরও।

-বুলুগুল মারাম পৃঃ ২০২, বুখারী ৪০৪, ৪০১, ১২২৬, ৬৬৭১, ৭২৪৯, মুসলিম ৫৭২, তিরমিযী ৩৯২,৩৯৩, নাসায়ী ১২৪০, ১২৪১, ১২৪২, ১২৫৬, আবু দাউদ ১২১৯, ১০২০, ১০২২, ইবনু মাজাহ ১২০৩, ১২০৫, ১২১১, আহমাদ ৩৫৫৬, ৩৫৯১, ৩৮৭৩, ৩৯৬৫, ৪০২২।

হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাঃ) থেকে বর্ননা করেছেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, নামাযে যেকোন ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পরেই দু'টি সিজদাহ দিতে হবে। -হাসান সুনান আবু দাউদ হা/১০৩৮।

৮। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের কেও যখন তাঁর নামাজ ভুল করে অতঃপর সে বলতে পারছেনা সে কি ১ না ২ রাকাআত পড়েছে তখন এক রাকাআত কে ভিত্তি করবে, অনুরূপ দুই / তিন রাকাআতের ক্ষেত্রে দুই রাকাআত কে, অনুরূপ তিন/চার রাকাআতের ক্ষেত্রে তিন রাকাআতকে ভিত্তি করে বাকী রাকাআত পূর্ন করে সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদাহ করবে"। -সহীহ সুনান আত-তিরমিযী হা-৩৯৮।

সুতরাং সহীহ হাদীসের আলোকে নামাজের মধ্যে ভুলের জন্য সহো সিজদাহ দুই ধরনের–

প্রথমঃ

তাশাহুদের বৈঠকে বসতে ভুলে গেলে বা কোন ওয়াজিব তরক করলে, পরবর্তীতে মনে হলে এবং নামাজে কয় রাকাআত পড়া হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ হলে, কম সংখ্যাক রাকাআত হিসাবে ধরে বাকী রাকাআত পূর্ন করতে হবে, অতঃপর নামাজের শেষ পর্যায়ে সালাম ফেরানোর পূর্বেই দুইটি সিজদা দিয়ে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করা।

দ্বিতীয়ঃ

নামাজে কোন রাকাআত বেশি হলে ও তা সর্বশেষ বুঝতে পারলে নামাজের শেষে ডানে ও বামে সালাম ফেরানোর পর তাকবীর বলে দুইটি সিজদাহ দেওয়া। [আলোচনা সূত্র- "জামাতে রাসূল (সাঃ) এর নামাজ" পৃঃ ১৬৪, ১৬৫, ছাঃ রাঃ, স্ব; মুঃ]

অনেক সহীহ হাদীসের বিপরীতে একটিমাত্র হাদীস যাতে সহো সিজদার পর পূনরায় তাশাহুদ পরার কথা বলা হয়েছে। একদিকে সালাম ফেরানোর পরে সহো সিজদা দেয়ার কোন জাল, যয়ীফ হাদীসেও দলিল নেই।

এখন হাদীসটিকে দেখা যাক-

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) তাদের সালাতে ইমামতি করতে গিয়ে একদিন ভুল করেছেন, ফলে তিনি দু'টি সহো সিজদা করলেন, তারপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরালেন।

-তিরমিযী ৩৯৫, এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন। এই হাদীসটি নাসায়ী ১২৩৭, ১৩৩১, ইবনু মাজাহ ১২১৫, আহমাদ ১৯৩৬০ নং এ আছে।

আলোচনাঃ

ফাতহুল বারী (৩/১১৯) গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেন, অতঃপর তিনি তাশাহুদ পাঠ করলেন, কথাটি শায, সঠিক হচ্ছে, তা তাশাহুদের কথা উলে- খ নেই। অনুরূপভাবে আশ-শায়েখ নাসির“দ্দিন আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৪০৩পৃঃ) ও যয়ীফ আবু দাউদ (১০৩৯), তাখরীজ মিশকাত গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি যয়ীফ ও শায বলে উলে- খ করেছেন। উক্ত হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিরোধী, কারণ একই রাবী ইমরান (রাঃ) থেকে সহীহুল বুখারী ৪৮২ নং হাদিসের বর্ননায় সহো সিজদার পর উভয় পার্শ্বে সালাম ফেরানোর উলে- খ আছে। তাশাহুদ পড়ার কোন বর্ননা নেই। [সূত্রঃ মুঃ মহসিন ২৭৭পৃঃ, বুলুগুল মারাম ২০৫পৃঃ, সহীহুল বুখারী হা-৪৮২]

সুতরাং পাঠকগন আপনারা বিবেচনা করে সিদধান্ড় নেবেন, আপনি সহীহ হাদীস ভিত্তিক নামাজ পড়বেন নাকি দলীলবিহীন পরবর্তিতে মাযহাবের নামে সৃষ্ট নতুন পদ্ধতিতে গৎবাঁধা নামাজ পড়বেন।

বিতর নামাজ

এক রাকাত বিতরঃ হাদীস প্রমাণঃ

১) আব্দুল-াহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) রাতের নফল নামাজ দুই রাকাত পড়তেন এবং এক রাকাত বিতর পড়তেন। [সহীহ বুখারী- ৯৩৬,৯৩২,৯৩৪, মুসলিম ১২৫১ ।]

২) আব্দুল-াহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেন, “বিতর হচ্ছে শেষ রাতে এক রাকাত নামাজ।” [সহীহ মুসলিম ১২৪৭ ।]

৩) অনুরূপ হাদীস, ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, “বিতর হচ্ছে শেষ রাতে এক রাকাত নামাজ”। [সহীহ-মুসলিম ১২৪৯ ।]

৪) আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, “........ যে এক রাকাত বিতর পড়তে চায় সে এক রাকাত পড়তে পারে। [সহীহ-আবু দাঊদ ১২১২, ইবনু মাজাহ ১১৮০ ।]

সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, সা'দ ইবনে আবী আক্কাস, মু'আজ বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব, আবু মূসা আশআরী ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, মুআবিয়া, তাবেয়ীদের মধ্যে ইমাম বূখারী, মুহাম্মদ বিন সিরীন

(রাঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (রাঃ) এবং প্রচলিত চার মাযহাবের তিন ঈমাম ঈমাম মালেক, শাফেয়ী, আহামাদ (রাঃ) প্রমূখও এক রাকাত বিতর পড়া যায় এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। (সূত্রঃ নায়লুন আওতার থেকে আইনী তোহফা ১/২২২পৃঃ, আঃ আঃ কা: ২৮পৃঃ)

অনুরূপ আরেকটি হাদীস (সহীহ) আছে তিরমিযীতে (হা-৪৬১), আবু দাউদে (১৪২১-সহীহ) এবং সুনান ইবনে মাযাহতে, আলবানীর তাহক্কীক সূত্রে সহীহ আরো বেশ কটি হাদীস আছে বিতর এর অধ্যায়ে। (সূত্র: আশ-শায়েখ মুহাম্মদ আলবানী পৃঃ১৩৩)

আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিতর সালাত অপরিহার্য। সুতরাং কেউ ইচ্ছে হলে পাঁচ রাকাত আদায় করবে কেউ তিন রাকাত আদায় করতে চাইলে সে তাই করবে এবং কেউ এক রাকাত আদায় করতে চাইলে সে এক রাকাআত আদায় করবে। [সহীহ আহমাদ ৫/৪১৮, আবু দাউদ ১৪২২, নাসায়ী ১৭১০, ইবনু মজাহ ১১৯০, দারিমী ১৫৮২]

তবে অবশ্যই উত্তম যে তিন রাকাত বা ততোধিক বিতর পড়া যেমন সহীহ হাদীসে সাব্যস্ড় আছে। শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে, অত্যধিক দুর্বলতা, সময়ের বিশেষ স্বল্পতা ইত্যাদি অলঙ্ঘনীয় অযুহাত ছাড়া তিন বা ততোধিক রাকাত বিতর পড়াই উত্তম। নবী (সাঃ) সাধারণত রাতের নফল সালাত বা তাহাজ্জুদ সালাত ২ রাকাত করে পড়তে পড়তে শেষ করতেন এক রাকাত বিতর দিয়ে। সুতরাং এশার নামাজের পর শুধু এক রাকাত বিতর পড়ার মাসয়ালা গ্রহণ করা উচিত নয়।

তিন রাকাত বিতরঃ

তিন রাকাত বিতরই অত্যাধিক প্রচলিত এবং সর্বজনবিদিত এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস আছে এবং কোন দ্বিমত নেই, তবে বিতর পড়ার প্রচলিত নিয়ম সহীহ নয়।

সহীহ পদ্ধতিতে তিন রাকাত বিতর এর পক্ষে দলীল-

প্রথম পদ্ধতি:

১) রাসূল (সাঃ) যখন বিতরের নামাজ তিন রাকাত পড়তেন, প্রথমে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন, পরবর্তিতে এক রাকাত সালাত আদায় করতেন ও সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতেন।

২) হযরত আব্দুল-াহ ইবনে ওমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি তিন রাকাত বিতরের দুই রাকাত ও এক রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরিয়ে পৃথক করে নিতেন এবং তিনি বলেছেন নবী (সাঃ) এরূপই করতেব। {সহীহ-ইবনে হিব্বান ২৪৩০, মুয়াত্তা মালেক হাঃ২০}

৩) ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, একদা এক বেদুইন নবী (সাঃ) কে রাতের সালাত সম্মন্ধে জিজ্ঞেস করলে দুই আঙ্গুল দিয়ে ঈশারা করে বলেন, দু'দু'রাকাআত এবং রাতের শেষভাগে বিতর এক রাকাআত। [সহীহ মুসলিম- অধ্যায় মুসাফিরের সালাত, নাসায়ী হা/১৬৯০, আহমাদ ২/৪০, আঃ দাউদ ১৪২১।] অনুরূপ হাদীস আরো আছে, হাকেম (হাঃ ১/৩০৪) বায়হাকী (হাঃ ৩/২৮, ৩/৩১)

[সুত্র- জামাতে রাসূল (সাঃ) এর নামাজ- পৃঃ ১৩৪, স্বঃ মুঃ- পৃঃ২৯৪, বুখারী হা/৯৯১, সিলসিলা সহীহা হা/২৯৬২, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২০, মুঃ মুহসিন ৩৩৩ পৃঃ এর আলোচনা]

(৪) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি বাড়িতে থাকা অবস্থায় রাসূল (সাঃ) কক্ষের মধ্যে নামাজ পড়তেন। তিনি দু'রাকাআত এবং এক রাকাআত এর মাঝে পৃথক করতেন, এসময় তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে জোরে সালাম দিতেন। [সহীহ-আহমাদ ২৩৩৯৮।]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, নবী (সাঃ) এক রাকাআত বিতর পড়তেন। তিনি দু'রাকাত এবং এক রাকাত এর মাঝে কথা বলতেন। সহীহ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, শায়েখ আলবানী বলেন, হাদীসটি সনদ শায়খায়ন (বুখারী মুসলিমের) শর্তনুযায়ী সহীহ। [দ্রঃ ইরউয়াউল গালীল হা/৪২০।]

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ

রাসূল (সাঃ) যখন বিতর সালাত তিন রাকাত আদায় করতেন তখন দুই রাকাত পড়ে বসতেন না কিংবা তাশাহুদ ও পড়তেন না বরং একসাথে তিন রাকাত শেষ করেই বসতেন।

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল-াহ (সাঃ) তিন রাকাত বিতর পড়তেন, তিনি শেষের রাকাত ব্যতিত বসতেন না। [সহীহ মুস্ড়দরাক হাকেম হা/১১৪০, বায়হাকী ৪৮০৩, ৩য় খন্ড পৃঃ ৪১, তা'সীসুল আহকাম ২/২৬২ পৃঃ]

বিশেষ সতর্কতা- মুস্ড়দরাক হাকিমে বর্ণিত (বসতেন না) শব্দকে পরিবর্তন করে পরবর্তি ছাপাতে (সালাম ফিরাতেন না) করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিস পূর্বের "বসতেন না" উলে-খ করেছেন। (হাকেম হা/১১৪০, ফাথহুল বারী হা/৯৯৮ এর আলোচনা, আল আরফুশ শাযী ২/১৪ পৃঃ)

দুঃখজনক হলো- আল-াম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রাঃ) নিজে স্বীকার করেছেন, আমি মুস্ড়দরাক হাকিমের তিনটি কপি দেখেছি কিন্তু কোথাও (সালাম ফিরাতেন না) শব্দটি পাইনি। তবে হেদায়ার হাদীস বিশে- ষক আল-ামা যায়লাঈ উক্ত শব্দ উলে- খ করেছেন।

সুধী পাঠকঃ ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫হিঃ) নিজে হাদীসটি সংকলন করেছেন আর তিনিই সঠিকটি জানেন না, বহুদিন পরে এসে আল-ামা যায়লাঈ (মৃত ৭৬২ হিঃ) সঠিকটা জানালেন? মাযহাবের অন্ধ গোড়ামির কারনে হাদীস এর শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে।(সূত্রঃ মুঃ মঃ)

(২) ইবনু ত্বাউস তাঁর পিতা থেকে বর্ননা করেন যে, রাসূল (সাঃ) তিন রাকাআত বিতর পড়তেন, মাঝে বসতেন না। [সহীহ- মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৪৬৬৯।]

(৩) ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) তিন রাকাত বিতর নামাজ পড়তেন এবং শেষের রাকাত ছাড়া তিনি বসতেন না। [সহীহ- মারফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১৪৭১, ৪/২৪০। বিস্ড়রিত ইরউয়াল গালীল হা/৪১৮ এর আলোচনা।]

(৪) আত্বা (রাঃ) তিন রাকাআত বিতর পড়তেন কিন্তু মাঝে বসতেঁন না এবং শেষ রাকাত ব্যতিত তাশাহুদ পড়তেন না। [সহীহ- মুস্ড়দরাক হাকেম হা/১১৪২।]

(৫) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বিতর নামাজে প্রথম রাকাআত "সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আলা", দ্বিতীয় রাকাতে "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং তৃতীয় রাকাআতে "কুল হুয়াল-াহু আহাদ" পড়তেন, আর সবগুলো রাকাআত শেষ করেই সালাম ফিরাতেন। [সহীহ- নাসাঈ হা/১৬৮১।]

মাগরিবের মত তিন রাকাআত বিতর পড়ার পক্ষে দুইটি যঈফ হাদীস

এ ব্যাপারে আব্দুল-াহ ইবনু ওমার (রাঃ) ও ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর সূত্রে দুইটি হাদীস বর্ননা করা হয় যে- মাগরিবের সালাত দিনের বিতর সালাত অথবা রাত্রির তিন রাকাত বিতর দিনের বিতরের ন্যায়। যেমন- মাগরিবের সালাত। যা মালেক মুওয়াত্তা হা/২৫৪ ও দারাকুতনী হা/১৬৭২, বায়হাক্বী ৩/৩১ এ আছে।

আলোচনাঃ- প্রথমটির সনদ যঈফ, মুহাদ্দিস শু'আইব আরনাউত বলেন, মাগরিবের সালাত অংশটুকু সহীহ নয়। দ্বিতীয়টির ব্যপারে ইমাম দারাকুতনী যিনি নিজেই হাদীসটির সংকলক তিনি বলেছেন, এটি যইফ। ইমাম বায়হাক্বী হাদীসটি বর্ননা করে বলেছেন, এটি যইফ এবং ইমাম দারাকুতনী এর বিপরিতে পরবর্তিতে বর্ণিত সহীহ হাদীসটিকে উলে-খ করেছেন।

বিপক্ষে হাদীসঃ

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "তোমরা মাগরিবের নামাজের সাথে সাদৃশ্য করে তিন রাকাত বিতর পড়না। পাঁচ, সাত বা নয় রাকাত দ্বারা পড় বা এগার রাকাআত বিতর পড়।

সহীহ দারাকুতনী ২/২৪, ত্বাহভী হা/১৭৩৯, তাহাভী, দারাকুতনী, ইবনু হিব্বান, হাকিম হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিম এর শর্তানুযায়ী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন ও ইমাম তাহাবী সমর্থন করেছেন। ইবনু হাযার ও শাওক্বানীও সহীহ বলেছেন। ফাথহুল বারী ২/৫৫৮, নায়লুল আওতার ৩/৪২-৪৩, শায়েখ আলবানী ও সহীহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন (সালাতুত-তারাবীহ ৮৪ ও ৯৭ পৃঃ)। [আলোচনা সুত্র- মুঃ মুহসিন ৩২৯-৩৩১পৃঃ, আঃ আঃ কাঃ- ৩২-৩৪পৃঃ]

পাঁচ রাকাত বিতরঃ

১। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) পাঁচ রাকাআত বিতর পড়তেন, এর মধ্যে কোথাও বসতেন না, একেবারে শেষ রাকাআতে বসতেন।

সহীহ মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৫২০, সুনান নাসাঈ হা/১৬৯৮, অনুরূপ হাদীস আছে মিশকাত ১২৫৬ নং।

২। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর রাতের নামাজের সংখ্যা ছিল তের রাকাত, এর মধ্যে পাঁচ রাকাত তিনি বিতর নামাজ আদায় করতেন। এবং পাঁচ রাকাত আদায় করা শেষ হলেই তিনি বসতেন। সহীহ- তিরমিযি ৪৫৯, আঃ দাউদ ১২০৯, ১২১০, সালাতুত তারাবীহ, মুসলিম।

সাত রাকাআত বিতরঃ

১। আয়েশা (রাঃ) বলেন নবী বয়স্ক হয়ে যাওয়ার কারনে শরীর ভারী হয়ে গেলে সাত রাকাত বিতর পড়তেন, তাঁর মধ্যে শেষ রাকাতে তাশাহুদে বসতেন। সহীহ- মুসলিম, অধ্যায় মুসাফিরের নামাজ হা/১২৩৩, মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৫২০।

২। উম্মু সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) পাঁচ রাকাত ও সাত রাকাত বিতর পড়তেন। এ পাঁচ রাকাত নামাজের মাঝে তিনি সালাম ফেরাতেন না বা কোন কথাও বলতেন না। অর্থাৎ একাধারে পাঁচ বা সাত রাকাত নামাজ পড়তেন। -সহীহ-নাসাঈ হা/১৬৯৯।

এভাবে ৯,১১, এবং ১৩ রাকাত বিতর পড়ার সহীহ বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত রয়েছে রাসূল (সাঃ) থেকে যা প্রমানিত।

তবে সংখ্যা যাই হোক, নবী (সাঃ) দুই দুই রাকাত পড়ে শেষে এক রাকাআত পড়ে শেষ করতেন অথবা একটানা পড়ে শেষ রাকাআতের পর শেষ বৈঠকেই শুধু বসতেন ও সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতেন। [আলোচনা সূত্রঃ আঃ আঃ শাফী ২৬-৩৮পৃঃ, মুঃ মুহসিন ৩২৬-৩৩৩পৃঃ, স্বাঃ মুঃ ২৯৩,২৯৪পৃঃ, রাসূল (সাঃ) এর নামাজ ১৩২-১৩৫পৃঃ]

বিতরে দোয়া কুনুত পড়ার সহীহ নিয়মঃ

১ম নিয়মঃ শেষ রাকাতে ক্বিরাত শেষ করে হাতবাধা অবস্থায় দো'আয়ে কুনুত পড়া। আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১ পৃঃ, ২/১৮১ পৃঃ, (সুত্র-মুঃ মহসিন ৩৩৬পৃঃ)।

১) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) তিন রাকাত বিতর নামাজ আদায় করতেন, প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফের"ন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তিনি কুনুত র"কুর পুর্বে পড়তেন ক্বিরাতের শেষে। যখন তিনি সালাত থেকে অবসর হতেন তখন বলতেন "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস"। শেষের বার টেনে বলতেন। -সহীহ-নাসাঈ হা/১৬৯৯, ১/১৯১, ইবনে মাজাহ হা/১১৮২, ইরউয়াউল গালীল হা/৪২৬।

২) আসিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিককে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন র"কুর পুর্বে পড়া হত। সহীহ বুখারী ১০০২।

৩) অনুরূপ আবু দাউদ এর হাদীস হাঃ ১৪২৭ (সহীহ) তে, আলী ইবনে আবু তালিব সূত্রে অপর এক বড় হাদীসেও র"কুর পুর্বে কুনুত পাঠ করার কথা বলা হয়েছে।

২য় নিয়মঃ শেষের রাকাতের পরে র"কুর পরে উঠে দাঁড়িয়ে বুক বরাবর হাত তুলে দো'য়া কুনুত পড়া।

১) আবু হুরাইয়রাহ (রাঃ) থেকে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) যখন কারো বির"দ্ধে বা কারো পক্ষে দোআ করতেন র"কুর পরে কুনুত পড়তেন। সহীহ মুত্তাফাক আলাইহি মিশকাত হা/১২৮৮।

২) ইমাম বায়হাক্বী বলেন, র"কুর পরে কুনুতে রাবীগন সংখ্যায় অধিক থেকে অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন। -বায়হাক্বী ২/২০৮, তুহফাতুল আওয়াযী (কারারা ১৪০৭/১৯৮৭) হা/৪৬৩ এর আলোচনা দ্রষ্টব্য , ২/৫৬৬ পৃঃ (সূত্রঃ সালাতুর রাসূল-আসাদুল-াহ আল গালীব ১৬৬ পৃঃ)।

৩) হযরত ওমার, আব্দুল-াহ ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিতর এর কুনুতে র"কুর পরে উঠে দাঁড়িয়ে বুক বরাবর হাত তুলে দো'য়া করা প্রমানিত আছে। [বায়হাক্বী ২/২১১-১২, মির'আত ৪/৩০৭, তুহফা ২/৫৬৭।]

অনুরূপ আছে মিরআত ৪/৩০৭, ছিফাত ১৫৯ পৃঃ, মিশকাত হা/১২৯০, (সূত্রঃ ছাঃ রাসূল-আঃ আঃ গালীব- ১৬৭ পৃঃ)

সুতরাং র"কুর আগে হাত বাধা অবস্থায় বা দুই হাত তুলে ও র"কুর পরে দাঁড়িয়ে বুক বরাবর হাত তুলে দোয়ায়ে কুনুত পড়া উভয়েই যায়েজ ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ড়।

প্রচলিত নিয়মে কুনুত পড়ার পুর্বে তাকবীর দেওয়া ও হাত উত্তোলন করে হাত বাধা ভিত্তিহীনঃ

১। কুনুত পড়ার জন্য র"কুর পুর্বে তাকবীরে তাহরীমা এর ন্যায় দুইহাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। -ইরউয়াউল গালীল হা/৪২৭, মির'আত ৪/২৯৯, কুনুত অনুচ্ছেদ ৩৬, (সূত্রঃ ছাঃ রাঃ পৃঃ১৬৭)

২। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বিতর সালাতে কুনুত পড়তেন। আর তিনি যখন ক্বিরাত শেষ করতেন তিনি তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত তুলতেন। অতঃপর কুনুত পড়তেন। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭০২১-২৫, মুসান্নাফ আব্দুর-রাজ্জাক হা/৫০০১,

তাহক্বীক হল- বর্ণনাটি ভিত্তিহীন, আলবানী (রাঃ) বলেন আছরামের সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই। এমনকি তাঁর কিতাব সম্পর্কেও আমি অবগত নই। এই বর্ণনা সঠিক নয়। -ইরউয়াউল গালীল হা/৪২৭, ২/১৬৯পৃঃ।

আরো উলে-খ্য যে, উক্ত বর্ননায় পুনরায় হাত বাঁধার পর কুনুত পড়ার কথা নেই। এ মর্মে কোন দলীলও নেই, অথচ এটাই সমাজে চলছে। বরং এটাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। (সূত্রঃ মুঃ মুহসিন ৩৩৪ পৃঃ)

দোয়ায়ে কুনুত কোনটি?

অধিকাংশ মুসলি- বিতরের কুনুতে যে দোয়া পাঠ করেন, সেটা মুলতঃ কুনুতে নাযেলা। [বায়হাক্বী, সুনান কুবরা ২/২১০-২১১পৃঃ, সনদ, হাসান, ইরউয়াউল গালীল ২/১৭০পৃ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২১৩পৃঃ, বায়হাক্বী হা/৩১৪ ও ৩১৪৩, ২/২৯৮-২৯৯, সনদ সহীহ ইরওয়া হা/৪২৮, ২/১৭১পৃঃ] (সূত্রঃ মুঃ মুহসিন পৃঃ ৩৩৭)

এই কুনুতে নাযেলাহ যুদ্ধ, শত্রুর আক্রমন, কাফেরদের থেকে যদি মুসলমানদের উপর বিশেষ কোন বিপদ উপস্থিত হয় অথবা কারো জন্য বিশেষ কোন কল্যান কামনায় আল-াহর সাহায্য প্রার্থনা করে বিশেষভাবে এই দোয়া পাঠ করতে হয়। কুনুতে নাযেলাহ ফযর সালাতে বা সব ওয়াক্তে ফরজ সলাতের শেষ রাকাআতে র"কুর পরে দাঁড়িয়ে রাব্বানা লাকাল হামদ বলার পর দু'হাত উঠিয়ে সরবে পড়তে হয়। -মুত্তাফাক্ব আলাইহ আবু দাউদ, মিশকাত হা/১২৮৮-১২৯০, ছিফাত ১৫৯, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৪৮-১৪৯।

বায়হাক্বী ২/২১১ পৃঃ তে সহীহ মওসুল একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে, হযরত ওমার (রাঃ) ফজরের সালাতে প্রথমবার বিসমিল-াহ... সহ ইন্না নাস্ড়ইনুকা ... এবং

দ্বিতীয়বার বিসমিল-াহ্.. সহ ইন্না না'বুদুকা দিয়ে বর্ণিত দো'আ পড়তেন। উলে-খ্য যে, উক্ত কুনুতে নাযেলাহ থেকে মধ্যম অংশটুকু অর্থাৎ "ইন্না নাস্ড়'ইনুকা নিয়ে সেটাকে "কুনুতে বিতর" হিসেবে চালু করা হয়েছে, যা নিতান্ড়ই ভুল। আলবানী বলেন যে, এই দো'আটি ওমার (রাঃ) ফজরের সালাতে কুনুতে নাযেলাহ হিসাবে পড়তেন। এটাকে তিনি বিতরের কুনুত পড়েছেন বলে আমি জানতে পারিনি। (ইরউয়াউল গালীল হা/৪২৮, ২/১৭২পৃঃ) [সূত্রঃ ছাঃ রাঃ ১৭১পৃঃ]

সহীহ দো'আয়ে কুনুতঃ

হাসান ইবনু আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাকে বিতর সালাতে কুনুত পড়ার জন্য কতগুলো বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি বিতর সালাতে কুনুতে পড়ে থাকি।

"আল-াহুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়াআফিনী ফীমান আফায়তা, ওয়াবারিকলী ফিমা আ'ফায়তা, ওয়া তাওয়াল-ানী ফিমান তাওয়াল-ায়তা, ওয়া বা-রিকলী ফীমা আত্বায়তা, ওয়াক্বিনী শাররা মা কাদায়তা, ফাইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইয়ুকদা আলায়কা ইন্নাহু লা ইয়াদিল-ু মা ওয়ালায়তা, ওয়া লা ইয়া"ইযঝু মান আ-দায়তা, তাবারকতা রাব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা"।

"হে আল-াহ, তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো, যাদের তুমি হিদায়াত দান করেছো তাদের সাথে। আমাকে মাফ করে দাও, যাঁদের তুমি মাফ করে দিয়েছ তাদের সাথে, আমার অভিভাবক হও যাঁদের অভিভাবক হয়েছ তাদের সাথে। তুমি আমাকে যা দান করেছ তাতে বরকত দাও, আর আমাকে ঐ অনিষ্ট হতে বাচাও , যা তুমি নির্ধারন করেছ। তুমি ফয়সালা কর, কিন্তু তোমার উপরে কেও ফায়সালা করতে পারেনা। তুমি যার সাথে শত্রুতা রাখো, সে সম্মান লাভ করতে পারেনা। নিশ্চই অপমান হয়না সেই, যাকে তুমি মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছো। হে আমার রব, তুমি বরকতময়, তুমি সুউচ্চ।

সহীহ- বুলুগুল মারাম ৩০৮, আবু দাউদ ১৪২৫, তিরমিযি ৪৬৪, নাসাঈ ১৭৪৫, ১৭৪৬, ইঃ মাঃ ১১৭৪, আহমাদ ১৭২০, ২৭৮২০, দারেমী ১৫৯১, বায়হাক্বী ২য় খ ২০৯ পৃঃ হা/৪৬৩৭,৩২৬৩, তাবারানী ২৭০১, ২৭০৩, ২৫০৫, ২৫০৭, আবু দাউদ ১৪২৫।

আবুল হাওরা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, অপর একটি অনুরূপ হাদীস (সনদ সহীহ) আছে আঃ দাঃ হা/১৪২৫, ইবনু মাজাহ (অধ্যায় সালাত কায়েম অনুঃ বিতরের কুনুত হা ১১৭৮) ইবনু খুযাইমাহ হা/১০৯৫।

এই দো'য়ায়ে কুনুতই সর্বজনবিদিত ও সহীহ এবং সমগ্র আরব বিশ্বে এই দো'আয়ে কুনুত পড়া হয় ইহাই সহীহ দলিল দ্বারা সুসাব্যস্ড়।

২। এছাড়াও আরেকটি দো'আয়ে কুনুতের কথা হাদীসে আছে, তা হলো, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বিতরের শেষ রাকাতে এই দোয়াটি পড়তেন,

"আল-হুম্মা ইন্নি আউযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমু'আফাতিকা মিন "উকুবিকা ওয়াআউযুবিকা মিনকা লা উহসী সানা'আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা"।

"হে আল-াহ আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার ক্রোধ হতে আশ্রয় চাই। আপনার শাস্তি হতে আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আশ্রয় চাই। আমি আপনার থেকে সর্বপ্রকারের আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারবনা। আপনি নিজের প্রশংসা যেভাবে করেছেন আপনি সেরূপই"।

সহীহ আবু দাউদ হা/১৪২৭, নাসাঈ হা/১৭২৯, শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (দ্রঃ ইরউয়াউল গালীল হা/৪৩০, মিশকাত-আলবানী ১/৩৯৯ পৃঃ হা/১২৭৬) (সূত্রঃ বিতর সালাত, আঃ আঃ কা ৪৫পৃঃ + সহীহ আবু দাউদ ৩৬৩ পৃঃ)

শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দর"দ ও দোয়ায়ে মাসূরার পরে সালাম ফিরানোর পুর্বে পঠিতব্য দোয়াঃ

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল-াহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তাশাহুদ পড়ে শেষ করবে অর্থাৎ দর"দ পড়ার পর চারটি জিনিস থেকে আল-াহর নিকট পানাহ চাওয়ার জন্য বলেছেন। তা হলো- "আল-াহুম্মা মিন আযাবি জাহান্নামা, ওয়া মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহীদ-দাজ্জাল"।

অর্থাৎ "হে আল-াহ, আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, জীবন ও মরনের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জাল এর ফিতনা থেকে"। -সহীহ বুলুগুল মারাম ৩১৮, বুখারী ১৪৭৭, মুসলিম ৫৮৮, তিঃ ৩৬০৪, নাসায়ী ১৩১০, ৫৫০৫, ৫৫০৬, ৫৫০৮, ৫৫০৯, আবু দাউদ ৯৮৩, ইবনু মাজাহ ৯০৯, আহমাদ ৭১৯৬, ৩৭২৮০, ১০৩৮৯, দারেমী ১৩৪৪।

২। অনুরূপ আরেকটি হাদীস আছে হযরত আব্দুল-াহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সহীহ মুসলিম হা/১৩৩৩।

৩। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) তাঁর নামাজের মধ্যে "উলে-খিত ঐ" দোয়া পড়তেন এবং তাঁর সাথে তিনি আরো বলতেন "আল-াহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল মা'সামী, ওয়াল মাগরামী"- অর্থাৎ "হে আল-াহ! আমি তোমার কাছে গুনাহ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই।"

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বললো- ইয়া রাসুলুল-াহ! আপনি ঋনগ্রস্থ হওয়া থেকে কেন আশ্রয় প্রার্থনা করেন? একথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, কেউ যখন ঋনগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন সে কথা বললে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে বসে। -সহীহ বুখারী হা/৮৩২, (কিতাবুল আমান)।

[একই সাথে আমরা প্রতিনিয়ত দোয়ায়ে মাসূরা "আল-াহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসী ...." পড়ি, তা অনেকগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা (বুলুগুল মারাম ৩১৯, বুখারী ৬৩২৬,

৭৩৮৮, ৮৩৪, মুসলিম ২৭০৫, তিরমিযী ৩৫৩১, নাসাই ১৩০২, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, আহমাদ ৮,২৯) প্রমানিত।

সুতরাং দরূদ শরীফ পড়ে এরপর দো'য়ায়ে মাসূরা এবং উপরে বর্ণিত দো'আটি উভয়ই পড়তে হবে। কোনটি আগে পরে বিষয়টি ধর্তব্য নয়। যেহেতু উভয় দো'আ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত এবং সালাম ফিরানোর আগে দো'আ কবুলের সময়, দো'য়া করার সময়, সেহেতু উভয়ই পড়া উচিত] সূত্রঃ- জামাতে রাসূল (সাঃ) এর নামাজ ১৩০, ১৩১, দাঃ রাসূল (দাঃ) আঃ আঃ গাঃ ১২০-১২২পৃঃ, বুলুগুল মারাম ১৯৯পৃঃ, স্বঃ মুঃ ১৩৩-১৩৪।

[বিঃ দ্রঃ- ইঃমাঃ, মুসলিম, তাবেয়ী ত্বাউস, শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রাঃ), শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বায সহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগন প্রথম দোয়াটিকে ওয়াজিব দোয়া মাসূরা বলেছেন, অর্থাৎ এই দোয়া পড়া ওয়াজিব বলেছেন]

সম্মিলিত মুনাজাত ও সমস্বরে "আমীন, আমীন" বলে মুনাজাত করার কোন সহীহ দলিল নেইঃ

(এই অংশটুকু বিতর্কিত মুনাজাত ও একটি নামাজ"- আব্দুল হামীদ ফাইযী, শারঈ মানদে মুনাজাত- মুজাফফর বিন মুহসিন, "রাসূল (সাঃ) এর জামাতে নামাজ"- আশশায়েখ মুঃ নাসিরুদ্দিন আলবানী ও আসাদুল-াহ আল গালীব এর সালাতুর রাসূল (ছাঃ রাঃ) থেকে নেয়া হয়েছে ও সহীহ হাদীস বইসমূহ থেকে তাহক্বীক্ব রেফারেন্স করা হয়েছে)

ফরজ নামাজের পর হাত তুলে জামাআতী দু'আ বিদআত তথা শরীয়াতে নব আবিষ্কৃত আমল। "মুনাজাত" অর্থ পরস্পর গোপন কথা বলা "আল- মুনজিদ প্রভৃতি"। -সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উক্ত অর্থেই মুনাজাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১) রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চই তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে"। সহীহ বুখারী ৪০৫, ১ম খ (ইসঃ ফাউন্ডেশন হা/৩৯৬)

২) রাসূল (সাঃ) বলেন, "নিশ্চই মুমিন যখন সালাতের মধ্যে থাকে তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে"। -সহীহ বুখারী হা/৪১৩, (ইসঃ ফাউন্ডেশন হা/৪০২)

৩) রাসূল (সাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতের দাঁড়াবে তখন সে যেন তাঁর সামনে থুথু না ফেলে। কারণ সে যতক্ষন মুছাল-াতে সালাত আদায় রত থাকে, ততক্ষন আল-াহর সাথে মুনাজাত করে"। -সহীহ বুখারী হা/৪১৩, (ইসঃ ফাউন্ডেশন হা/৪১৬), মুসলিম হা/১২৩০, মিশকাত হা/৬৫৮।

৪) রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ সালাতের দাঁড়ায় সে তখন তাঁর রবের সাথে মুনাজাত করে। অতএব মুনাজাতে সে কি বলে তা তাঁর জানা উচিত"। -সহীহ মুয়াত্তা, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৬, ৪৯২৮নং।

সুতরাং মুসলি- যে সালাতের মধ্যে সারাক্ষনই মুনাজাত করে এবং পুরো সালাতটাই যে তাঁর জন্য মুনাজাত তা উপরিউক্ত হাদীস থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

"তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ড় সালাতের সময়কাল", যা বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা বিভিন্ন সময় ব্যপ্ত করা হয়েছে। সমন্নিত মুনাজাত সালাতের অংশ নয়। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সালাত শেষ হয় এবং আল-াহর সাথে মুনাজাতের সম্পর্ক ছিন্ন

হয়। ছানা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ড় সালাতের সর্বত্র কেবল দো'আ আর দো'আ। অর্থ বুঝে বুঝে পড়লে উক্ত দো'আগুলির বাইরে বান্দার আর কিছু চাওয়ার থাকেনা। [যাদুল-মা'আছ (বৈর"তঃ মওয়াসসাসাতুর রিমালাহ ২৯ তম সংস্করন ১৯৯৬) ১/২৫০]

সালাতে দো'আর স্থানসমূহঃ

১) রাসূল (সাঃ) বলেন, সিজদার সময় বান্দা তাঁর প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌছে যায়, অতএব ঐ সময় তোমরা সাধ্যমত দো'আ করো। -সহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪, অর্থাৎ সিজদাতে বেশি বেশি দো'আ করতে হবে, ও তা কবুলের সম্ভাবনাও বেশী।

২) রাসূল (সাঃ) শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশি বেশি দোয়া করতেন। -সহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩। নবী (সাঃ) সালাম ফিরানোর পুর্বে সহীহ হদীসে বর্ণিত অনেকগুলো দো'আ করতেন, যা দোয়া মাসূরা নামে পরিচিত এবং মনের সমস্ড় ইচ্ছা ব্যাক্ত করতেন। (মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩)

এছাড়াও আরো কয়েকটি স্থানে দোয়া করা যায় সালাতের মাঝে।

৩) ছানা বা দোয়ায়ে ইস্ড়েফতাহ, যা হলো (আল-াহুম্মা বাঈদ বাঈনী ওয়া বাঈনা খাতায়িয়া ইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাসরিকি ওয়াল মাগরিবি। আল-াহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতায়িয়া কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াদু মিনাদদানাসি আল-াহুম্মা গ সিল খাতায়িয়া ইয়া বিল মায়ি ওয়াছছালজি ওয়াল বারাদী) -সহীহ বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ৫৯৮, নাসায়ী ৮৯৫, আবু দাউদ ৭৮১, ইবনু মাজাহ ৮০৫, আহমাদ ৭১২৪, ৯৪৮৯।

বাংলা অর্থ- "হে আল-াহ! আমার এবং আমার গুনাহর মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছো পুর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল-াহ আমাকে আমার গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করো যেমন সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার হয়। হে আল-াহ আমার গুনাহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।

প্রচলিত ছানা (সুবহানাকা আল-াহুম্মা .....) এর অর্থ হলো- মহিমা তোমার হে আল-াহ এবং প্রশংসাও, মর্যাদাসম্পন্ন রাজাধিরাজ, তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। -(আবু দাউদ ৭৭৫, তিরমিযী ২৪২, নাসায়ী ৮৯৯, ৯০০, ইবনু মাজাহ ৮০৪, আহমাদ ১১০৮১)

৪) শ্রেষ্ঠ দোআ হলো সূরা ফাতিহা।

৫) র"কু থেকে উঠার পর ক্বওমার দোআ "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ....." বা অন্য দোআ সমূহ।

৬) দুই সিজদাহর মাঝে বসে "আল-াহুমাগফিরলী....." বলে ছয়টি বিষয়ের উপর প্রার্থনা।

৭) র"কুতে দোআ।

সুতরাং দোয়ার স্থান হচ্ছে সালাতের মধ্যে। সালাতের বাইরে আলাদা সম্মিলিত ইমামসমেত মুনাজাত করে প্রতি ফরজ নামাজের পর, যে দোয়ার রীতি চালু আছে তা দলিল সম্মত নয় বরং সালাম ফিরানোর পর সুন্নাত হলো যিকির, তাসবীহ-তাহলীল পড়া যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমানিত এবং তা পরে উদ্ধৃত হয়েছে।

মুনাজাতের পক্ষে হাদীসসমূহঃ

১) আসওয়াদ আল আমেরী তাঁর পিতা থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা রাসূল (সাঃ) এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর ঘুরে বসলেন এবং তাঁর দু'হাত উঠালেন ও দোআ করলেন, (শায়খুল কুন ফিল কুন সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভী (১৮০৫-১৯০২), ফাতোয়াহ নাযিরিয়াহ (দিল-ী, ইদারাহ নুর-ল ইমান ৩য় প্রকাশ ১৪০৯/১৯৮৮) তুহফাতুল আওয়াযী (বৈর-ত, দার-ল কুতুব আল ইলমিয়াহ ১৪১০/১৯৯০)। তাহক্বীক- বর্ননাটি জাল।

সনদগত ত্রুটি- নাম আসওয়াদ আল আমেরী নয়, জাবির ইবনু ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আস সাওয়াঈ।

উক্ত হাদীসের শেষ অংশ- "অতঃপর তিনি দুহাত উপরে তুললেন এবং দো'আ করলেন" মূল কিতাবে নেই।

হাদীসটি মিয়া নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভী "ফতোয়াহ নাযিরিয়াহ" তে এবং আব্দুর রহমান মোবারকপুরী তুহফাতুল আওয়াযী" তে হুবহু এভাবে উলে- খ করেছেন এবং রেফারেন্স হিসাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহর বরাত দিয়েছেন। কিন্তু মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহতে উক্ত শেষ অংশটুকু নেই। (আল মুছান্নাফ, হাফেয আব্দুল-াহ ইবনু আবী শায়বাহ- বৈর-তে ছাপা, দার-ল ফিকহ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯খ্রীঃ, পৃঃ ৩৩৭, ১ম খ-)। শায়েখ আলবানী (রাঃ) বলেন এতে মিথ্যা ও ত্রুটি উভয়ই সংযুক্ত আছে। - সিলসিলাহ যয়ীফা ১২/৪৫৩পৃঃ।

২) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, "কোন বান্দা প্রত্যেক সালাতের পর স্বীয় দুই হাত প্রসারিত করে বলে, হে আল-াহ! ..... বিস্ড়ত দোআ রয়েছে, তখন তাঁর দু'হাত নিরাশ করে ফিরিয়ে না দেওয়া আল-াহর জন্য কর্তব্য হয়ে যায়। (জাল- হাফেয আবু বক্কর ইবনুসসুন্নী, আমালুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ হা/১৩৫, পৃঃ ৪৯, মুজামু ইবনুল আরাবী ১১৭৩) তাহক্বীক- জাল- মুহাম্মদ তাহের পাট্টানী তাঁর জাল হাদীসের গ্রন্থে বর্ননা করেছেন। [তাযকিরাতুল মাওযু'আত (বৈর-তে ছাপা ১৯৯৫, পৃঃ ৫৮]

ক) এর সনদে দুই জন রাবীর নামে ভুল আছে।

খ) আব্দুল আযীয নামক বর্ননাকারীও ত্রুটি পুর্ন (আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত-তাহযীব (বৈর-ত ৩/১৩০পৃঃ, রাবী নং ৭৯৫ এর আলোচনা)।

গ) খুযাইফ নামক ব্যক্তিও নানা অভিযোগে অভিযুক্ত (তাহযীবুত-তাহযীব ৩/১৩০)।

ঘ) তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আল-াহর রাসূল (সাঃ) সালাম ফিরানোর পর নিজ হাত দু'টিকে তুলে কিবলামুখী হয়ে বললেন, হে আল-াহ!, তুমি অলীদ-কে কাফেরদের কবল থেকে মুক্তি দাও"।

অনুরূপ আছে, তফসীর ত্বাবারীতে, উক্ত হাদীস নকল করার পর মোবারকপুরী বলেন, এই হাদীসটির সনদে আলী বিন যায়েদ বিন জায়আন রয়েছে, যিনি বিতর্কিত,(ইবনে হাজার একে যঈফ বলেছেন-তাক্বরীবুত তাহযীব)। সুতরাং এটি যইফ হাদীস ।

পক্ষান্ড়রে এই হাদীসটিই বুখারী মুসলিমে নিম্নরূপে আছে- "আবু হুরায়রা বলেন, আল-লাহর রাসূল (সাঃ) যখন কারো জন্য দোআ বা বদ্দোয়া করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি র"কুর পরে পড়তেন। তিনি বলতেন, "সামিয়াল-াহুলিমান হামিদাহ, রাব্বানা আলাকাল হামদ, হে আল-াহ তুমি অলীদকে মুক্তি দাও"।

সুতরাং যয়ীফ হাদীসে বলেছে, তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'আ করেছেন। পক্ষান্ড়রে বুখারী-মুসলিমের হাদীস বলছে, ঐ দু'আ র"কুর পরে করেছেন। আপনি কোন হাদীস মানবেন?

৪) আসওয়াদ আমেরী পিতার নিকট থেকে হাদীস বর্ননা করে বলেন আমি আল-াহর রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে নামাজ পড়তাম। তিনি যখন সালাম ফিরিয়ে মুক্তদিদের দিকে সামনা সামনি মুখ ফিরালেন, তখন তিনি দু'টি হাত তুলে দু'আ করলেন।

মুবারকপুরী (রাঃ) যিনি ইবনু আবী শায়বাহ সূত্রে মুছান্নাফ থেকে বর্ননা করেছেন, তাতে দেখা যায়, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/৩৩৭- এ মূল বইয়ে মুখ ফিরালেন পর্যন্ড় আছে, বাকী লাইনটি মুবারকপুরী (রাঃ) সংযোজন করেছেন।

এরূপ শায়খ নাসির"দ্দীন আলবানী তাঁর সিলসিলাহ যয়ীফাতে আরো দুইটি জাল হাদীস ব্যাখ্যা করেছেন যা সম্মিলিত মুনাজাতের দলিল হিসাবে পেশ করা হয়। [সিলসিলাহ যইফাহ হা/১২৪২, হা/২৫৪৪]

৫) সর্বশেষ যে হাদীসটি প্রতি ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মোনাযাতের দলিল হিসাবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় হাদীসটি হাসান।

একদা সাহাবীগন আল-াহর রাসূল (সাঃ) কে কোন সময় দো'আ অধিকরূপে কবুল হয় সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, গভীর রাতের শেষাংশে এবং সকল ফরজ নামাজের পশ্চাতে। (তিরমিযী ৩৪৯৯, নাসায়ী আমালুল ইয়াউমি আল-াইলাহ ১০৮ নং, মিশকাত ৯৬৮)

উক্ত হাদীসে আরবীতে যে শব্দ "দুবুর" ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হল পিঠ, পাছা বা পশ্চাৎ অর্থাৎ তাঁর অর্থ পরে নয়, তা হলো দেহাংশের বাইরের কিছু নয়। সুতরাং নামাজের "দুবুর" অর্থাৎ পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠদেশ বলাতে বুঝা দরকার যে, তা নামাজেরই শেষ অঙ্গ বা অংশ। নামাজের বাইরের কিছু নয়, অর্থাৎ সালাম ফিরার পুর্বের অংশ।

অসংখ্য সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, নামাজ বলতে শুর" হয় আল-াহু আকবার বা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে ও শেষ হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে (যা রফইল ইয়াদাইন ও নিয়তের অধ্যায়ে হাদীসগুলোতে বর্ণিত আছে)। তাহলে মোনাজাত, নামাজের বাইরে অতিরিক্ত কাজ, যা এখানে বোঝানো হয়নি। যদিও এই হাদীসটিতেও সম্মিলিত মোনাজাতের কথাও বলা হয়নি।

অপরপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখুন–

১। বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় পাবেন:

"একদা মহানবী (সাঃ) জুমার দিন দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এক মর"বাসী (বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল-াহর রাসূল (সাঃ)! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল আর

পরিবার পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল-াহর নিকট দু'আ কর"ন"। তখন নবী (সাঃ) তাঁর নিজের দু'হাত তুলে দু'আ করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দু'আর জন্য হাত তুললেন। ফলে এমন বৃষ্টি শুর" হল যে পরবর্তী জুমাতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, 'হে আল-াহর রাসূল (সাঃ)! ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দু'আ কর"ন। মহানবী (সাঃ) তখন নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টির বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করলেন এবং বৃষ্টিও থেমে গেল।

এটি ইস্ড়িকার নামাজ নয়, বরং ইস্ড়িকার দু'আর জন্য জামাআতবদ্ধভাবে হাত তোলা। এ দু'আ সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই। আর এ হাদীস দিয়ে আম দু'আতে হাত তোলার ব্যাপারেও কোন সমস্যা নেই। এই জন্যই ইমাম বুখারী তাঁর আলাদা পুস্ড়ক "কিতাবুদ দাওয়াতে" নয় বরং বুখারী শরীফেই "কিতাবুদ দাওয়াত" এ আনাসের ঐ হাদীস দ্বারা আম দু'আয় হাত তোলা বৈধ বলে প্রমাণ করেছেন।

সমস্যা হল এই হাদীস দিয়ে খাস দু'আ ফরজ নামাজের পর জামাআতী দু'আ প্রমাণ করায়। একবার ভেবে দেখুন, যেমনটি পূর্বেই জেনেছেন-যদি ফরজ নামাজের পর প্রচলিত মুনাজাত 'মামুল' হত, তাহলে কি ঐ বেদুইন খুতবা চলাকালে দু"আর আবেদন জানাতেন? এবং আল-াহর নবী (সাঃ) খুতবাতেই হাত তুলে দু'আ করতেন?

যে ইমাম বুখারী 'কিতাবুদ দাওয়াত' এ আম দু'আর জন্য হাত তুলার ব্যাপারে বাব বেধেছেন, সেই ইমাম বুখারী ঐ অধ্যায়েই বাব বেধে বলেছেন, 'বাবুস দুআই বা'দাস স্বালাহ' (নামাজের পর দু'আ)। তারপর যে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে দু'আয়ে মাসয়ালাহ্ (প্রার্থনামূলক দু'আ) এর কথা নেই; বরং তাতে দু'আয়ে যিকরের কথা আছে। সেখানে কিন্তু তিনি ওই শ্রেনীর হাদীস এনে নামাজের পর হাত তুলে দু'আ প্রমাণ করতে চাননি। কারণ তিনি একজন মুহাদ্দিস।

২। 'আল-আযরাক বিন কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন নবী (সাঃ) নামাজের সালাম ফিরিয়েছেন, ঐ মুহূর্তে একজন সাহাবী দাড়িয়েছেন, তৎক্ষণাৎ হযরত উমার (রাঃ) ঐ ব্যক্তির ঘাড় ধরে ঝাকানী দিয়ে বলল, বসো! এই জন্য আহলে কেতাবকে আল-াহ ধ্বংস করেছিলেন। কারণ তারা নামাজের পর যিকর ও দু'আতে সময় দিতেন না। তখন নবী (সাঃ) তাঁর দিকে দেখে বলেন- হে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)! তোমার দ্বারা আল-াহ তা'আলা হক কথাই বলিয়েছেন"।

এবার হাদীসটির আরবি এর সঠিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ আল-আযরাক বিন কাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন নবী (সাঃ) নামাজের সালাম ফিরিয়েছেন, ঐ মুহূর্তে একজন সাহাবী সাথে সাথে সুন্নাত পড়ার জন্য দাড়িয়েছেন। ততক্ষণাত উমার (রাঃ) ঐ ব্যক্তির ঘাড় ধরে ঝাকানী দিয়ে বলেন, বসো! এই জন্য আহলে কিতাবকে আল-াহ তা'আলা ধ্বংস করেছিলেন, কারণ তাদের নামাজসমূহের মধ্যে ব্যবধান থাকত না। তখন নবী (সাঃ) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার দ্বারা আল-াহ তা'আলা হক কথাই বলিয়েছেন। এ হাদীসটি সহীহ নয়; বরং যয়ীফ। (দেখুনঃ যয়ীফ আবু দাউদ)

এতে যিকির ও দু'আ অনুমান করে প্রমাণ হতে পারে; তবে হাত তুলে বা জামাআত করে নয়। পরন্তু উদ্দেশ্য ছিল, ফজর নামাজের সাথে মিলিয়ে সুন্নাত না পড়া। ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীসটি যে পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন, তাঁর শিরোনাম দিয়েছেন, সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে যে সেই জায়গাতেই সুন্নাত পড়ে, যে জায়গাতে ফরজ পড়েছে।

একাকী দু'হাত তুলে দো'আঃ

সালাতের বাইরে যে কোন সময় বান্দা তাঁর প্রভুর নিকট যে কোন ভাষায় দো'আ করবে, তবে হাদীসের দো'আই উত্তম।

১) বান্দা হাত তুলে একাকী নিরিবিলি কিছু প্রার্থনা করলে আল-াহ তাঁর হাত খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। [আবু দাউদ, মিশকাত হা/২২৪৪]

২) খোলা দু'হাতের তালু একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রেখে দো'আ করবে। [আঃ দাউদ হা/১৪৮৬-৮৭, ৮৯, মিশকাত হা/২২৫৬]

৩) রাসূল (সাঃ) থেকে স্বীয় উম্মাতের জন্য একাকী কেঁদে কেঁদে দোয়া (মুসলিম হা/৪৯৯), বদরের যুদ্ধের দিন একাকী হাত তুলে দোয়া (মুসলিম হা/৪৫৮৮), বনু জাযীমা গোত্রের নিহত লোকদের জন্য একাকী দু'হাত তুলে দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া [বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৩৯, হা/৩৯৭৬] ইত্যাদি বেশ আরো কটি সহীহ হাদীস আছে যা একাকী হাত তুলে দোয়া করার (সেটা যে কোন সময়ে) পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।

৪) হজ্ব ও ওমরাতে সাঈ করার সময় "সাফা" পাহাড়ে উঠে দু'হাত তুলে দোয়া করা (আঃ দাউদ হা/১৮৭২, মিশকাত হা/২৫৫৫) এবং আরাফার ময়দানে (হা/নাসাঈ ৩০১১), জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর (বুখারী হা/১৭৫১-৫৩) একাকী দু'হাত তুলে দোয়া করার কথা বর্ণিত আছে।এছাড়াও সহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৪৬১, ফাতওয়া লাজমা দায়েমা হা/৮/২৩০-৩২, ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম পৃঃ ৩৯২ এইসব জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও আলিমগনের হাদীস ও ফতোয়া সংকলন অনুযায়ী- জুম'আ ও ঈদায়েনের খুতবায় ও অন্যান্য সভা ও সম্মেলনে অথবা আমভাবে কোন বিশেষ সময়ে বা স্থানে একজন দোআ করলে অন্যরা সেই সাথে শরীক হবেন এবং আমীন বলবেন কেবল, দু'হাত তুলা ছাড়াই, অধিক সম্মত, তবে দু'হাত তুলেও করতে পারেন।

সাউদী আরবের মুফতিগনের স্থায়ী কমিটি আছে। এরূপ ইলমী তথ্যানুসন্ধান ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি [আব্দুল-াহ বিন কুইদ (সদস্য), আব্দুল-াহ বিন গুদাইয়ান (সদস্য), আব্দুর-রাজ্জাক আফীফী (উপপ্রধান), আব্দুল-াহ আযীয বিন আব্দুল-াহ বিন বায (প্রধান)] কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়া ৩৯০১ এবং ৫৭৬৩ তে প্রতি ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাতকে "বিদআত" বলে রায় দিয়েছেন। আল-ামা শায়েখ ইবনে উসাইমীন এবং আল-ামা শায়েখ নাসির-দ্দীন আলবানীর মত জগদ্বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও মুহাদ্দিসগনের একই মতামত।

অনেকে বলেন, "ওরা কি জানতেন না, যারা এতদিন নিয়মিতভাবে দু'আ করে গেলেন?" কিন্তু এর উত্তরে এও প্রশ্ন করতে পারি, 'ওরা কি জানতেন না, যারা কখনো মুনাজাত করে যাননি, বা জানেন না, যারা এখনো মুনাজাত করেন না?' সুতরাং দলিলই প্রমাণ করবে কে জানতেন আর কে জানতেন না। পক্ষান্ড়রে যারা ইজতিহাদে ভুল করে

গেছেন, আল-াহ তাদের ভুল ক্ষমা করবেন এবং তাঁরা একটি নেকীর অধিকারীও হবেন। অতএব যারা না জেনে করে গেছেন তাদেরকে "বিদআতী" বলার অধিকারও কারো নেই। তবে সঠিক পথ জানার পর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যই ওয়াজিব।

অনেকে বলেন, দু'আ তো ভাল জিনিস। ওতে ক্ষতি কি? কিন্তু ভাল হলেই বাড়তি করার অধিকার আছে, তা নয়। নামাজ ভাল বলে দুই রাকাতের স্থানে তিন রাকাত বেশি পড়া যায়না। দরূদ ভাল হলেই জামাআতী সমস্বরে বা দাঁড়িয়ে কিয়াম করে দরূদ পড়া যায় না। এই বাড়তি করার নামই তো বিদআত।

অনেকে বলেন, 'দু'আ উঠে গেল তাইতো নানা কষ্ট, নানা বিপদ-আপদ দেখা দিচ্ছে মুসলিম সমাজে'। অবশ্য এমন লোকেরা নামাজের পর হাত তুলে দুআ ছাড়া অন্য দুআ চিনেন না। তাইতো কেউ ফরজ নামাজের পর মুনাজাত না করলে অনেকে কুরআনের আয়াত থেকে দলিল উদ্ধৃত করে তাকে জাহান্নামী বানিয়ে থাকেন! কারণ, আল-াহ বলেন, "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট দোআ কর, আমি তা কবুল করব। যারা অহংকারে আমার ইবাদাত (দুয়া) করায় বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। (সূরা মুমিন ৬০ আয়াত)

বলাই বাহুল্য যে, এমন বক্তার নিকট দুআ এবং ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দুআর মাঝে কোন পার্থক্যই নেই।

অনেকে বলেন, 'ফরজ নামাজের পর ঐরূপ দুআ করতে নিষেধ আছে কি'? কিন্তু নিষেধ না থাকলে যদি করা যেত, তাহলে তো বহু কিছু করা যায়। আযান ও নামাজ ভাল জিনিষ বলে সকাল নয়টায় আযান দিয়ে জামাত করে নামাজ পড়তে পারি কি? কারণ ঐ সময় তো ঐ আমল নিষেধ নয়। তবে দরূদে সমস্বরকে কেন বিদআত বলি, সমস্বরে দরূদ তো নিষেধ নয়.....ইত্যাদি। এরূপ মুনাজাত নেই, তাঁর প্রমাণ হলো হাদীসে বা আসারে তাঁর উলে-খ নেই। পরন্তু কোন ইবাদাত "নেই" প্রমাণ করতে কোন দলিলের প্রয়োজন হয় না; কারণ 'নেই' এর দলীলই হল কুরআন হাদীসে এর উলে-খ নেই। অবশ্য 'আছে' প্রমাণ করতে স্পষ্ট দলীল জর"রী। তাই তো যে কর্ম করতে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ আছে তা করাকে হারাম বলে, 'বিদআত' নয়। পক্ষান্ড়রে যা 'আছে' বলে প্রমাণ নেই তা দ্বীন ও ভাল মনে করে করাকেই নতুনত্ব বা বিদআত বলে।

ফরজ নামাজের পর সুন্নাত হলো, আল-াহর যিকির করা। সম্মিলিত মুনাজাতের বিদআত, এই সুপ্রতিষ্টিত ও প্রমাণিত সুন্নাতকে বিদায় করে দিয়েছে প্রায়।

ফরজ সালাত বাদে সম্মিলিত দো'আঃ

ফরজ সালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তদীদের সরবে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল-াহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম হতে এর পক্ষে সহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই। বলা আবশ্যক যে, আজও মক্কা ও মদীনার দুই হারামের মসজিদে উক্ত প্রথার কোন অস্থিত্ব নেই।

প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিকসমূহঃ

১) এটি সুন্নাত বিরোধী আমল। অতএব তা যত মিষ্ট ও সুন্দর মনে হোক না কেন সূরায়ে কাহাফ-এর ১০৩-৪ নং আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্থ আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

২) এর ফলে মুসলি- স্বীয় সালাতের চাইতে সালাতের বাইরের বিষয় অর্থাৎ প্রচলিত "মুনাজাত"কেই বেশি গুরুত্ব দেয়। আর এজন্যই বর্তমানে মানুষ ফরজ সালাতের চাইতে মুনাজাতকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং 'আখেরী মুনাজাত' নামক বিদ'আতী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বেশি আগ্রহ বোধ করছে ও দলে দলে সেখানে ভিড় জমাচ্ছে।

৩) এর মন্দ পরিণতিতে একজন মুসল-ী সারা জীবন সালাত আদায় করেও কোন কিছুর অর্থ শিখে না। বরং সালাত শেষে ইমামের মুনাজাতের মুখাপেক্ষী থাকে।

৪) ইমাম আরবী মুনাজাতে কি বললেন সে কিছুই বুঝতে পারেনা। ওদিকে নিজেও কিছু বলতে পারেনা। এর পুর্বে সে সালাতের মধ্যে যে দো'আগুলো পড়েছে, অর্থ না জানার কারণে সে সেখানেও অন্তর ঢেলে দিতে পারেনি। ফলে জীবনভর ঐ মুসল-ীর অবস্থা থাকে 'না ঘরকা না ঘাটকা'।

৫) মুসল-ীর মনের কথা ইমাম সাহেবের অজানা থাকার ফলে মুসল-ীর কেবল 'আমীন' বলাই সার হয়।

৬) ইমাম সাহেবের দীর্ঘক্ষণ আরবী-উর্দু-বাংলায় বা অন্য ভাষায় করুন সুরে মুনাজাতের মাধ্যমে শ্রোতা ও মুসল-ীদের মন জয় করা অন্যতম উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফলে 'রিয়া' ও 'শ্রুতি'-র কবীরা গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'রিয়া' কে হাদীসে 'ছোট শিরক' বলা হয়েছে।যার ফলে ইমাম সাহেবের সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

সালাতে হাত তুলে সম্মিলিত দো'আঃ

১। 'ইস্তিস্কা' অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতে ইমাম ও মুক্তদী সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দোআ করবে। এতদ্ব্যতীত

২। 'কুনুতে নাযেলাহ' ও 'কুনুতে বিতরে'ও করতে পারবে।

নামাজে সালাম ফিরানোর পর সুসাব্যস্ত সুন্নাত হলো যিকির করাঃ

"তারপর তোমরা যখন নামাজ শেষ করবে, দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল-াহকে স্মরন কর। - সূরা নিসা ১০৩ আয়াত।

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) এর সময় মুসল-ীগন ফরজ সালাত শেষ হলে উচ্চস্বরে যিকির করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এইরূপ শুনে বুঝতাম মুসল-ীগন সালাত শেষ করেছেন। -সহীহ বুখারী হা/৮৪১।

(২) তবে অন্যান্য বেশ কিছু হাদীসে রাসূল (সাঃ) স্বরবে যিকির করতে নিষেধ করেছেন।

-বুখারী হা/২৭৮৪, ৫/২২২পৃঃ, মুসলিম হা/৭০৭৩, মিশকাত হা/২৩০৩, প্রঃ ২০১, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৯৫, ৫/৮৭ পৃঃ দো'আ সমুহ অধ্যায়। নামাজ হচ্ছে দো'আর জায়গা আর নামাজ শেষে সালাম ফিরানোর পর হচ্ছে আল-াহর যিকির করার সময়। ইহাই

সুসাব্যস্ড় সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত এবং অন্যান্য মুসল-ীর যাতে অসুবিধা না হয় সেরূপ নিম্নস্বরে যিকির করাই উত্তম।

প্রতি ফরজ নামাজের পর নবী (সাঃ) কতৃক প্রমাণিত যিকিরসমূহঃ

১) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল-াহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত (ফরজ) সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল-াহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল-াহ ও ৩৩ বার আল-াহু আকবার বলবে, এটা মোট ১০০ বার পূরণ করার জন্য বলবে,

'লা ইলাহা ইল-াল-াহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুলি- শাইয়িন ক্বাদীর'।

অর্থঃ এক মাত্র আল-াহ ব্যতীত অন্য কোন গ্রষ্টা নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, আধিপত্য তাঁর, প্রশংশা তাঁর এবং তিনিই সকল শক্তির অধিকারী। যে ব্যক্তি পাঠ করবে তাঁর পাপরাশি ক্ষমা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়ে থাকে।

মুসলিম ৫৯৭, আবু দাউদ ১৫০৪, আহমাদ ৮৬১৬, ৯৮৯৭, মুওয়াত্তা মালেক ৪৮৮, ৩২৫, হাদীসটি সহীহ।

২) সাওরান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (সাঃ) সালাত হতে সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার আসতাগফির্ল-াহ (আল-াহর নিকট ক্ষমা চাইছি) বলতেন এবং আরো বলতেন-

'আল-াহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল-জালালি ওয়াল ইকরাম'।

অর্থঃ আমি আল-াহর ক্ষমা চাই (তিন বার)। হে আল-াহ, তুমি সালাম ও শান্ড়িময় এবং তোমার কাছ থেকেই শান্ড়ি আসে। হে মহান, মহিমাময় ও মহানুভব।

মুসলিম ৫৯১, আবু দাউদ ১৫১২, তিরমীযী ৩০০, আহমাদ ২১৯০২, দারেমী ১৩৪৮, মুসলিমে হাদীসটির শেষে রয়েছে, ওয়ালিদ (রাঃ) বলেন, আওযায়ীকে বললাম, ইস্ড়িাফার কিভাবে করব? তিনি বললেন, তুমি 'আমি আল-াহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি" বলবে।

৩) সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) এসমস্ড় বাক্য দিয়ে আল-াহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, **"আল-াহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনি, ওয়াআ'উযুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়াআ'উযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া আযাবিল কাবরি"।**

হে আল-াহ! আমি কাপুর্ষতা থেকে, কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি বার্ধক্যের অসহায়ত্ব থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমি দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

বুখারী ২৮২২, ৬৩৬৫, ৬৩৭০, ৬৩৭৪, ৬৩৯০, তিরমিযী ৩৫৬৭, নাসায়ী ৫৪৪৫, ৫৪৪৭, ৫৪৮৩, আহমাদ ১৫৮৯, ১৬২৪। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সা'দ (রাঃ) তেমনি তাঁর সন্ড়ানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন।

৪) 'লা ইলাহা ইল-াল-াহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুলি- শাইয়িন ক্বদীর; লা হাওলা ওলা কুওউয়াতা ইল-া বিল-াহ (উচ্চস্বরে)।

সালাম ফিরানোর পর রাসূল (সাঃ) এটুকু সর্বোচ্চ স্বরে পড়তেন।

অর্থঃ নেই কোন উপাস্য আল-াহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তারই জন্য সকল রাজত্ব ও তারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল-াহ ব্যতীত। -মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩, 'সালাত' অধ্যায়-৪, 'সালাতের পর যিকির' অনুচ্ছেদ-১৮।

এটি ফজর ও মাগরিবের নামাযে সালাম ফিরানোর পর ১০ বার পড়লে দশটি নেকী লাভ হবে, দশটি গুনাহ ঝরবে, দশটি মর্যাদা বাড়বে, চারটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। (সহীহ তারগীব ২৬২-২৬৩পৃঃ)।

৫) 'আল-াহুম্মা আ'ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা। আল-াহুম্মা লা মা-নে'আ লেমা আ'ত্বায়তা অলা মু'ত্বিয়া লেমা মানা'তা অলা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দে মিনকাল জাদ্দু'।

অর্থঃ হে আল-াহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদাত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন। -আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯।

হে আল-াহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ারও কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারেনা আপনার রহমত ব্যতীত। -মুত্তাফাক্ব'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬২।

৬) আবু উসামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে কেউ আয়াতুল কুরসী প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর পাঠ করলে তাঁর মৃত্যুই তাঁর জন্য জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বাধা হয়ে আছে। নাসায়ী, ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন। তাবারানী বৃদ্ধি করেছেনঃ এবং **"কুলহু আল-াহু আহাদ"**।

তাবারানীর এই বর্ধিত অংশটুকুর সনদ উত্তম। অনুরূপ কথা বলেছেন, মুনিযিরী তাঁর তাগরীব (২/২৬১) এ এবং হায়সামী তাঁর মাজমায় (১০/১০২)।

আয়াতুল কুরসীঃ

'আল-া-হু লা ইলা-হা ইল-া হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতুউ ওয়ালা নাউম। লাহূ মা-ফিস সামা-ওয়াতে ওয়ামা ফিল আরদ। মান যাল-াযী ইয়াশফা'উ ইনদাহু ইল-া বিইযনিহি। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল-া বিমা শা-আ; ওয়াসে-আ কুরসিইয়ুহুস সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরদ; ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিইয়ুল আযীম' (বাক্বারাহ ২/২৫৫)

অর্থঃ আল-াহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে পাকড়াও করতে পারেনা। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর

জ্ঞানসমুদ্র হতে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনা, কেবল যতটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমগ্র আসমান ও জমিন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্তাবধান তাকে মোটেই শ্রান্ড় করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান।

৭) মু'আয বিন জাবাল থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি অবশ্যই ফরজ নামাজের পরে এ দু'আটি বলতে ছাড়বেনা, "আল-াহুম্মা আ-ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনী ইবাদাতিকা"। অর্থঃ হে আল-াহ আমি তোমার নিকটে তোমার স্মরণের, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার ও তোমার উত্তম বন্দেগী করার সহযোগীতা চাই। আহমাদ, আবু দাউদ আর নাসায়ী- একটি মজবুত সনদে।

আবু দাউদ ১৫২২, নাসায়ী ১৩০৩, আহমাদ ২১৬২১। উকবাহ বিন মুসলিম বলেন, "আব্দুর রহমান আল হুবলা সুনাবিহী (রাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি (সুনাবিহী) মুয়ায (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) মুয়াযকে বললেন, হে মুয়ায, আল-াহর শপথ আমি নিশ্চই তোমাকে ভালবাসি। তখন মুয়ায বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক হে আল-াহর রাসূল। আমিও আপনাকে ভালবাসি। আবু দাউদ ও আহমাদের বর্ণনায় উক্ত হাদীসের শেষে রয়েছে , মুয়ায (রাঃ) সুনাবিহীকে প্রত্যেক সালাতের শেষে উক্ত বর্ণিত দো'আ পাঠ করতে ওসীয়ত করলেন এবং সুনাবিহীও আবূ আব্দুর রহমানকে এ ব্যাপারে ওসীয়ত করলেন। আহমাদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, আবূ আব্দুর রহমান উকবাহ বিন মুসলিমকে উক্ত দো'আ পাঠ করতে ওসীয়ত করেছেন। এখান থেকে দোয়াটি প্রত্যেক সালাতের শেষে পাঠ করার মর্যাদা বুঝা যায়।

৮) মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর বলতেনঃ

"লা ইলাহা ইল-াল-াহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু য়ুহয়ী ইয়ুমীতু বিয়্যাদিহিল খাইর ওয়া হুয়া আলা কুলি- শাইয়িন ক্বদীর"।

অর্থঃ আল-াহ ভিন্ন কেউ সত্য মাবূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য সমস্ড় রাজত্ব এবং তারই নিমিত্তে সকল প্রশংসা, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মরণ দান করেন এবং তিনিই সর্বোপরি ক্ষমতাবান। এটি ফজরের নামাজের পর পা ঘুরিয়ে বসার পুর্বে ১০০ বার পড়লে পৃথিবীর মধ্যে ঐ সেই ব্যক্তিই অধিক উত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবে। (সহীহ তারগীব ২৬২-২৬৩পৃঃ)।

৯) সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একবার করে। (আবু দাউদ ২/৮৬, সহীহ তিরমিযী ১/৮, নাসাঈ ৩/৬৮)

১০) আল-াহুম্মা ইন্নী আস-আলুকা ইল্মান না-ফিআউ অ রিযকান ত্বাইয়িবাউ অ আমালান মুতাকাব্বালা।

অর্থঃ হে আল-াহ! নিশ্চই আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাজের পর এটি পঠনীয়। (সইমা ১/১৫২, ত্বাবা সাগীর, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ১০/১১১)।

১১) সুবহানাল-াহি ওয়া বিহামদিহী, সুবাহানাল-াহিল আযীম। অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে "সুবাহানাল-াহে ওয়া বিহামদিহী পড়বে।

অর্থঃ মহাপবিত্র আল-াহ ও সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল-াহ, যিনি মহান'। এই দোয়া পাঠের ফলে তাঁর সকল গুনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়। রাসুলুল-াহ (সাঃ) এই দোআ সম্পর্কে বলেন যে, দুটি কালেমা রয়েছে, যা রহমানের নিকট খুব প্রিয়, যবানে বলতে খুব হালকা এবং মিযানের পাল-ায় খুবই ভারী, তাহলো, "সুবাহানাল-াহি.....। (সহীহ মুত্তাফাক্ব আলাইহি মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮, বুখারী হা/৭৫৬৩(তাওহীদ অধ্যায়)।

১২) আল-াহুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান না-র (৩ বার)।

অর্থঃ হে আল-াহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও! (সহীহ তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮)

১৩) সুবাহানাল-া-হে ওয়া বেহামদিহি আদাদা খালকিহী ওয়া রিদা নাফসিহী ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালেমা-তিহি (৩বার)।

অর্থঃ মহাপবিত্র আল-াহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমান, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওজন ও মহিমাময় বাক্য সমুহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ। (সহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১, আবু দাউদ হা/১৫০৩)

১৪) আল-া-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বেফাদলেকা আম্মান সেওয়া-কা।

অর্থঃ হে আল-াহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট কর ন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন কর ন! রাসূল (সাঃ) বলেন, এই দোয়ার পরে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল-াহ তাঁর ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। -তিরমিযী, বায়হাক্বী (দা'ওয়াতুল কাবীর), মিশকাত হা/২৪৪৯, 'দোয়া সমূহ' অধ্যায়-৯, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোআ অনুচ্ছেদ- ৭, ছহীহাহ হা/২৬৬।

১৫) আস্ত্বগফির ল-া-হাল-াযী লা ইলাহা ইল-া হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি'।

অর্থঃ আমি আল-াহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি। এই দোআ পড়লে আল-াহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়। রাসুলুল-াহ (সাঃ) দৈনিক ১০০ বার করে তওবা করতেন। -মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪।

১৬) রাসূলুল-াহ (সাঃ) প্রত্যেক সালাতের শেষে সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস' পড়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার সময় সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে মাথা ও চেহারা সহ সাধ্যমত সমস্ড় শরীর হাত বুলাতেন। তিনি এটি তিনবার করতেন। -মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৩২, 'কুরআনের ফাজায়েল' অধ্যায়-৮।

নারী ও পুর ষের সালাত পদ্ধতিতে পার্থক্য নেইঃ

নারী ও পুর ষের সালাত পদ্ধতির কোন বড় পার্থক্য নেই। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা সালাত আদায় কর যেমনটি তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ[বুখারী]।

এখানে তিনি নারী ও পুর"ষকে আলাদা পদ্ধতি পালন করতে বলেননি অথবা আয়েশা (রাঃ) কে নারীদের সালাত দেখাতে এবং তিনি (সাঃ) পুর"ষদের আলাদা সালাত দেখাননি। যা আছে তা সুক্ষ্ম পার্থক্য।

নারী ও পুর"ষের সালাতের পদ্ধতির পার্থক্যঃ

পুর"ষ	মহিলা	
মাথা	না ঢাকলেও চলবে	ঢেকে রাখতে হবে
পায়ের গোড়ালি	ঢাকবে না	ঢেকে রাখতে হবে
কাতারে দাঁড়ানো	সামনে	পিছনে
ইমাম ভুল করল	সুবহানাল-াহ বলবে	হাততালি দিবে
তাকবিরের পর হাত	খোলা থাকবে	পর্দায় থাকবে

সালাতের বিবিধ জ্ঞাতব্যঃ

১। রাসূল (সা:) সালাতের মধ্যে তিনটি বিষয় নিষেধ করেছেন:

ক) মোরগের মত ঠোকর দিয়ে সিজদা করে দ্র"ত সালাত পড়া

খ) বানর বা কুকুরের মত চার হাত-পা একত্র করে বসা

গ) শৃগালের মত এদিক-ওদিক তাকানো।

(আহমাদ, মুফাল্লাফ ইবনে আবী শায়বাহ্, সহিহ আত-তারগীব, হা/ ৫৫৩; ছিফাত পৃ: ৭০, ১১২)

২। বাচ্চাদের পৃথকভাবে পিছনের কাতারে দাঁড়ানোর হাদীস, যয়ীফ (আ. দা. হা/৬৭৭, মিশকাত হা/১১১৫, 'দাঁড়ানোর স্থান', অনু: ৫)

৩। হাই উঠলে 'হা' করে শব্দ করে বা বেশি মুখ হা করে হাই তোলা যাবে না, হাত দিয়ে মুখ চেপে রাখতে বা হাই তোলা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে। নাহলে শয়তান হাসে অথবা মুখে ঢুকে পড়ে। [বুখারী, মিশকাত হা/৯৮৬, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৫]

৪। হাঁচি এলে 'আলহামদুলিল-াহ্' বলা যাবে (তি: আ: দা: মিশকাত হা/৯৯২, অনু: ১৯)

৫। ফরয সালাতের স্থান থেকে কিছুটা সরে গিয়ে সুন্নত-নফল আদায় করা মুস্ত্বাহাব। (আ: দা: ই: মা: হা/১৪১৭, মি. হা/৯৫৩; ছা: রা: ১৫৭-১৬০)

৬। ফরয বা সুন্নাত নফল পড়া অবস্থায় প্রয়োজনে কিবলার দিকের দরজা খুলে দেয়া যাবে (বু: ৭৫৩, সি: ১০০৫, আ. দা:, আ: ৩)। অতএব জর"রী প্রয়োজনে মোবাইল বন্ধ করা বা রিংটোন বন্ধ করা ইত্যাদি সালাতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী বা ক্ষতিকর কোন কাজে দ্র"ত ও সংক্ষেপে নড়াচড়া করা যায়েজ।

মাযহাব মানা না মানা ও প্রকৃত চিত্র

এই অধ্যায়ের অংশটুকু "রাসূল (সাঃ) এর সালাত ও রাত্রি দিনের যিকির" সংকলনঃ ইউসূফ ইয়াসীন, "মুসলিম কি চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণে বাধ্য?"-মুঃ সুলতান আল-মাসূমী আল-খুযান্দী আল-মাক্কী (শিক্ষক, আল-মাসজিদুল হারাম), "তাক্বলীদ"-ইমাম

আশ-শাওকানী (রাঃ), "রাসূল (সাঃ) এর জামাতে নামাজ"-আশ-শায়েখ মুঃ নাসির্দ্দীন আলবানী (রাঃ), "মাযহাবের স্বার্থে শত শত সহীহ হাদীস বর্জন, ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় কি?"- আবুল কালাম মুঃ আব্দুর রহমান (কুরআন-সুন্নাহ রিসাচ সেন্টার) ও "আমাদের মাযহাব কি বিভিন্নভাবে বিভক্ত?"-মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফখর্ল, "সুন্নাতে রাসূল ও চার ইমামের অবস্থান"-আবু আব্দুল-াহ মুঃ শহীদুল-াহ খান মাদানী ও মহামান্য চার ইমামের পরিচয় ও তাদের মহামুল্যবান বানী সমূহ, রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ ও সুন্নাতের পরিপন্থী তাদের কথাসমুহ বর্জনে মুঃ ইব্রাহীম আলমাদানী, দাঈ, ধর্মমন্ত্রণালয়, সুউদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া- অবলম্বনে নেওয়া হয়েছে।

দ্বীনে ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর বিজয় দানের জন্য মহান আল-াহ মুহাম্মদ (সাঃ) কে রাসূল হিসাবে নির্বাচন করে হিদায়াত ও দ্বীনে হাক্ব সহকারে প্রেরণ করেছেন।

অতএব তিনিই বিশ্ব মুসলিমের জন্য একমাত্র রাসূল ও একমাত্র ইমাম (নেতা) তথা ইমামগনেরও ইমাম। তিনিই একমাত্র নিষ্পাপ ইমাম এবং অভ্রান্ড় সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম তথা ইমামে আযম। তাকেই ইমাম হিসাবে গ্রহণের তাওফিক আল-াহ আমাদের সবাইকে দিন।

মহান আল-াহ যেভাবে বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন-(আল ইমরান-১০৩) এবং সতর্ক করার জন্য তাদেরকে জানিয়েও দিয়েছেন যে, দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, তাদের সাথে রাসূল (সাঃ)'র কোন সম্পর্ক নাই-(আন'আম-১৫৯)। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানগন সেই আদেশ, নিষেধ ও সতর্কবাণী সবকিছুকে উপেক্ষা করে দলে দলে তথা মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং অখন্ড দ্বীনে ইসলামকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। যেমন কেউ হানাফি হয়েছে তো কেউ মালেকী হয়েছে, কেউ শাফেয়ী হয়েছে তো কেউ আবার হাম্বালী হয়েছে। প্রত্যেকে মুসলিম হওয়া সত্বেও আলাদা আলাদা মাযহাব তথা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

চার মাযহাবের কোন একটির নির্দিষ্টভাবে অন্ধ অনুসরণ করা ফরজ ওয়াজিব তো দুরের কথা, মুস্ড়াহাবও নয়।

মাযহাবসমূহ হচ্ছে কতিপয় (শরঈ) বিষয়ে মনীষীদের নিজস্ব মতামত, চিন্ড়া ভাবনা বা গবেষনা মাত্র। এর অনুসরণ করা আল-াহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কারো উপরই ওয়াজিব করেননি। তাঁর কারণ, এর মধ্যে যেমন কিছু ঠিক আছে, তেমন কিছু বেঠিকও আছে। আর নিরংকুশ সঠিক তো তাই যা রাসূল (সাঃ) হতে সুপ্রমাণিত। পক্ষান্ড়রে ইমামগণ বহু মাসয়ালাতে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের পর যখন দেখেছেন যে, সঠিক সিদ্ধান্ড় অন্যটি, তখন নিজ মতামত পরিত্যাগ করে সঠিক সিদ্ধান্ড্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি সকল মাসয়ালাতে কোন নির্দিষ্ট মাযহাব আকড়ে ধরে থাকে, সে নির্ঘাত গোঁড়া এবং ভুলকারী ও অন্ধ অনুসারী। সে ঐ লোকেদের অন্ড়র্ভুক্ত যারা নিজেদের দ্বীন (ধর্ম) কে টুকরা টুকরা করে নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ আল-াহ তা'আলা দ্বীনের ভিতর ফাটল সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।

আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন- "নিশ্চই যারা নিজেদের দ্বীনকে বিখন্ডিত করেছে এবং নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, (হে নবী) তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।

আল-াহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন- "এবং মুশরিকদের অন্ড়র্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের ধর্মে ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল- রয়েছে। [সূরা র ম(পারা৩০-আয়াত ৩১-৩২)]

অতএব ইসলাম একটিমাত্র ধর্মের নাম। তাতে কোন মাযহাব নেই এবং আল-াহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ত্বরীকা ও আদর্শ ছাড়া কোন ত্বরীকাও নাই।

কোন ইমামই বলেননি যে, তোমরা আমার মতের অনুসরণ কর। বরং তারা এর বিপরীতে বলেছেন যে, তোমরা সেখান থেকে (শরীয়ত) গ্রহণ কর, যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। তদুপরি এই মাযহাব সমূহের সাথে যুক্ত হয়েছে পরবর্তীকালের বহু মনীষীর বহু চিন্ড়া চেতনা। যার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে এবং এমন বহু কাল্পনিক মাসয়ালা রয়েছে ঐ সব ইমামগণ যদি দেখতেন যাঁদের মাযহাবের নাম দিয়ে এগুলো চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তারা ঐ সকল মাসয়ালা ও তাঁর আবিষ্কারকদের থেকে নিজেদের সম্পুর্ণ মুক্ত বলে ঘোষনা করতেন।

প্রত্যেক পুর্বসূরী ইমাম যেমন ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, সুফিয়ান ছাওরী সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা, হাসান বাসরী, ক্বাযী আবু ইউসূফ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী, আব্দুর রহমান আল আওযায়ী, আব্দুল-াহ ইবনুল মুবারাক, ইমাম বুখারী, মুসলিম (রহিমাহুমুল-াহ আজমাঈন) প্রমুখ ইমামগণ, যাঁদের থেকে ইলমে দ্বীন আহরণ করা হয়, তারা সবাই কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেন এবং মানুষকেও তা গ্রহণ করার ও তদনুযায়ী আমল করার প্রতি উৎসাহিত করতেন। তারা সবাই বিদ'আতকে এবং নিষ্পাপ (রাসূল) ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির (অন্ধ অনুসরণ) কে ভয় করে চলতেন। আর একমাত্র নিষ্পাপ ব্যক্তি হচ্ছেন রাসুলুল-াহ (সাঃ)। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যত বড় ইমামই হোক না কেন তিনি কিন্তু নিষ্পাপ না। অতএব তাঁর (অনিষ্পাপ ব্যক্তির) সে সব কথা মানাই যাবে যা কুরআন হাদীসের অনুকূলে হবে আর যা কুরআন হাদীসের প্রতিকূলে হবে তা পরিত্যাজ্য।

সমাজে কিছু কিছু আলেমগন বা হুজুরগন তো মানুষকে চার ইমামের মধ্যে যে কোন একজনের নামে প্রচলিত মাযহাব ও তাঁর অন্ধ অনুসরণ করতে বাধ্য করেছেন। আর একটি মাযহাব নির্দিষ্টভাবে গ্রহণের পর অন্য কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের কোন কথা গ্রহণ এবং তদানুযায়ী আমল করা হারামও করে দিয়েছেন। তাদের এই আচরণ দেখে মনে হয় যে, তাঁর মুকাল-াদ (অন্ধভাবে অনুসৃত) ইমামকে যেন মান্যবর প্রেরিত নবী বানিয়ে নিয়েছেন। তারা ইমামের নাম ছাড়া আর কিছুই জানেনা। অথচ পরবর্তী যুগের কিছু লোক বহু মাসয়ালা বানিয়ে এবং বহু মাযহাবি নিয়ম সৃষ্ট করে ইমামের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। ফলে ততপরবর্তী যুগের লোকের ধারণা হচ্ছে যে, এটা আমাদের ইমামের কথা বা মাযহাব। কিন্তু বাস্ড়বে তা ইমাম সাহেবের কথা ও সিদ্ধান্ড়ের সম্পুর্ণ বিপরীত। এবং তাঁর সাথে ইমাম সাহেবের কোন সম্পর্কই নেই। যেমন পরবর্তীকালের অনেক হানাফী আলেম সালাতের তাশাহুদে তর্জনী আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করাকে হারাম করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে "ইয়াদুল-াহ"

(আল-াহর হাত) এর অর্থ করেন আল-াহর ক্ষমতা (আল-াহর কুদরতি হাত) এবং আল-াহ আরশের উপর সমুন্নত নন বরং সকল স্থানে বিরাজমান, এরকম ধারণা পোষণ করে থাকেন।

ইমাম চতুষ্টয়ের প্রথম ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করলে এ সম্বন্ধে সমস্ড় ভুলের অবসান হবে।

মহামতি ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)

তিনি মুসলিম জাহানের ইমাম। তাঁর উপনাম আবু হানীফা, নাম- আন-নোমান, পিতার নাম-ছাবেত। তিনি ৮০ হিজরীতে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৫০ হিজরীতে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে পরলোক গমণ করেন। তিনি পারস্য বংশোদ্ভুত এবং বিখ্যাত তাবেতাবেঈন ছিলেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং তাঁর যুগে তিনি এব্যাপারে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সাথীরা তাঁর বিভিন্ন বাণী ও বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। তবে সেগুলোর মূল সূর একটাই। সেটা হলোঃ হাদীস আকড়ে ধরা ওয়াজিব এবং ইমামদের যেসব মত হাদীসের খেলাফ সেগুলোর অনুসরণ পরিত্যাজ্য। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) বলে গেছেনঃ

১। হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব।

ইবনে আবেদীন তার 'আল-হাশিয়া' কিতাবের প্রথম খন্ডের ৬৩ পৃষ্ঠা এবং "রসমুল মুফতি' কিতাবের ১ম খন্ড ৪র্থ পৃষ্ঠায় একথা উলে- খ করেছেন।

২। আমরা কোন সুত্র থেকে মাসয়ালা গ্রহণ করেছি, তা জানার আগ পর্যন্ড় আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।

ইবনু আবদিল বার, ইবনুল কাইয়েম ২য় খন্ড ৩০৯ পৃঃ, ইবনু আবেদীন ষষ্ঠ খন্ড ২৯৩ পৃঃ, ২৯-৩২ পৃঃ, আশ-শা"রানি ১ম খন্ড, ৫৫ পৃঃ ইত্যাদি গ্রন্থ।

অপর বর্ণনায় তার এ কথাটি যোগ করে বলা হয়েছেঃ

'আমরা মানুষ। আজ যে কথা বলি কাল সে কথা প্রত্যাহার করি'।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'হে ইয়াকুব(আবু ইউসুফ), তোমার জন্য আফসোস! আমার কাছ থেকে যা শোনো তা সবই লিখ না। কারণ আজ আমি কোন বিষয়ে একটা মত পোষণ করি, আগামীকাল তা ত্যাগ করি। আর আগামীকাল যে মত পোষণ করি, পরশু তা ত্যাগ করি।

আমাদের মতে, শ্রদ্ধেয় ইমাম অধিকাংশ মাসয়ালায় কিয়াস করেছেন। যখনই তিনি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অন্য ক্বিয়াস বা হাদীস পেয়েছেন, তখনই আগের ক্বিয়াস বা হাদীস ত্যাগ করে পরবর্তীটির উপর আমল করেছেন। এ ব্যাপারে শা'রানি তাঁর আল মিযান গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন, তাঁর সার সংক্ষেপ হলোঃ ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর ব্যাপারে আমি সহ সকল ইনসাফকারীর বিশ্বাস হলো, হাদীস সহ ইসলামী শরীয়াহ লিপিবদ্ধ করার উদ্দ্যেশ্যে হাদীসের হাফিজগণ যখন বিভিন্ন দেশের শহর-বন্দর ও গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েন এবং নিজেদের মিশনে সাফল্য লাভ করেন, তখন পর্যন্ড় যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি হাদীসই গ্রহণ করতেন এবং তিনি যে ক্বিয়াস করেছেন তা ত্যাগ করতেন।

তখন অন্যান্য মাযহাবের মত তাঁর মাযহাবের ক্বিয়াস হ্রাস পেত। তাঁর আমলে তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণ বিভিন্ন শহর ও এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার কারণে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় তাঁর মাযহাবের ক্বিয়াস সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, ঐ সকল মাসয়ালার তখন হাদীস পাওয়া যায়নি। অন্যান্য মাযহাবের ইমামদের অবস্থা এর ব্যাতিক্রম। তাদের আমলে হাদীসের হাফিজগণ শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং হাদীস সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। ফলে অন্যান্য মাযহাবের ক্বিয়াসের সংখ্যা হ্রাস পায়। এ বিষয়ে আল-ামা আবুল হাসনাত তার 'আন-নাফে আল-কাবীর' গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় বিস্ড়ারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকরা তা পড়ে দেখতে পারেন। যে সব মাসয়ালায় ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) অনিচ্ছা স্বত্তেও সহীহ হাদীসের বিপরীতে মত প্রকাশ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য ওজর। কেননা, আল-াহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরের বিষয় দায়ী করবেন না। সে জন্য তাকে বিদ্রূপ করা যাবে না। অনেক যাহেল-মুর্খ লোক এরকম করে থাকে। বরং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। কেননা তিনি মুসলমানদের অন্যতম ইমাম। তাঁদের অসীলায় এই দ্বীন সংরক্ষিত আছে এবং আমাদের কাছে পৌছেছে। তারা ভুল শুদ্ধ যাই করুন না কেন, এর বিনিময়ে পুরস্কার পাবেন। তাঁর কোন অনুসারীর জন্যে সহীহ হাদীসের খেলাফ তাঁর মাসয়ালা মানা জরুরী নয়।

৩। আমার কোন কথা যদি কুরআন ও রাসূল (সাঃ) এর বানীর বিপরীত হয়, তাহলে আমার মত প্রত্যাখ্যান করো।

আল ইকায-আল ফোলানি-পৃঃ৫০। তিনি এটাকে ইমাম মুহাম্মদের বক্তব্য বলে উলে-খ করেছেন। তিনি বলেন, এ কথা মুজতাহিদের চাইতে মুক্বালি-দের জন্য বেশি প্রযোজ্য। আমি বলি, এই কথার উপর ভিত্তি করে ইমাম শা'রানি তাঁর আল মীযান গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যদি কেউ বলে, আমার ইমামের মৃত্যুর পর সহীহ হাদীস পেলে তা দিয়ে আমি কি করব? এর জওয়াব হচ্ছে, তাঁর উচিত সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করা।

কেননা, ইমাম জীবিত থাকলে তাকে এই আদেশই করতেন। সকল ইমাম শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। কেউ যদি বলে, যেহেতু ইমাম গ্রহণ করেন নি সেহেতু আমি সহীহ হাদীস গ্রহণ করবো না-এটাই অধিকাংশ মুক্বালি-দের মনোভাব- তাঁরা বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। তাদের উচিত ইমামের উপদেশ অনুযায়ী সহীহ হাদীসের উপর আমল করা। ইমামগণ জীবিত থাকলে তারা অবশ্যই সহীহ হাদীস মেনে চলতেন এবং নিজেদের ক্বিয়াস ত্যাগ করতেন।

৪। তোমরা যদি আমার কোন কথা কুরান আর সুন্নাহ এর বিপরীত দেখতে পাও, তাহলে আমার কথা দেয়ালে ছুড়ে মারবে আর কুরান ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে। [মীযানুল কুবরা; ১ম খন্ড, পৃঃ৫৭]

৫। ইমাম আবু হানিফা(রাঃ) কে প্রশ্ন করা হল, আপনার কোন কথা যদি আল-াহর কিতাব এর বিপরীত হয়, তখন কি করব? তিনি বললেন, আমার কথা পরিহার করবে। আবার প্রশ্ন করা হল রাসুল এর সহীহ হাদীস এর বিপরীত হয়?তিনি বলে-ন,রাসুল(সাঃ) এর কথার মোকাবেলায় আমার কথা পরিহার করবে আর সহীহ হাদীস গ্রহণ করবে।

সাহাবাদের থেকে প্রাপ্ত সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রেও তিনি তাই বললেন। [ইক্বদুল জীদ, পৃঃ৫৩, হাকীকাতুল ফিকাহ,পৃঃ৬৯]

৬।ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর নিকট কোন মাসয়ালা জানার জন্য কেউ গেলে তাঁর নিকট সে বিষয়ে কোন হাদীস বিদ্যমান না থাকলে তিনি ঐ মাসয়ালা সম্পর্কে রায় দিয়ে বলতেন, 'এটা নু'মান বিন সাবিতের রায়। আমাদের সামর্থ্যানুসারে এটাই উত্তম। তবে যদি কেউ এটা অপেক্ষা উত্তম রায় নিয়ে যদি উপনীত হতে পারে তবে সেটাই হবে সঠিক। -মীযানুল কুবরা, ১ম খন্ড, প্রঃ ৫৭।

৭। যদি কোন বিষয়ে দলীল প্রকাশ হয়ে যায়, তবে তোমরা তদানুযায়ী কথা বলবে। -রদ্দুল মুখতার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭।

ইমাম মালিক বিন আনাস (রাহঃ)

১। এ বিষয়ে ইমাম মালিক বিন আনাস (রাহঃ) বলেছেন, আমি মানুষ, ভুল-শুদ্ধ দুটোই করি। আমার রায় দেখো। যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পাও তা গ্রহণ করো এবং যা তাঁর বিপরীত পাও তা পরিত্যাগ করো। -আল-জামে ইবনু আবদিল বার, ২য় খন্ড, ৩২ পৃঃ। উসুলুল আহকাম-ইবনে হাযম, ষষ্ঠ খন্ড, ১৪৯পৃঃ আল-ফোলানীঃ ৭২পৃঃ।

২। তোমরা রায় বা ক্বিয়াস পন্থীদের (অর্থাৎ শুধু যারা কিয়াসের ভিত্তিতে কথা বলে তাদের) থেকে বেঁচে থাকো। কেননা তারা সুন্নাতের শত্রু।-আল-আহকাম ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৬পৃঃ,

৩। তিনি আরো বলতেন, রাসূল (সাঃ) এর পর এমন কোন ব্যক্তি নেই যার কথা ও কাজ সমালোচনার উর্ধ্বে। -ইরশাদুস সালিকঃ ১ম খন্ড, পৃঃ-২২৭, উসূলুল আহকাম, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৪৫।

ইমাম শাফে'য়ী (রাহঃ)

১। এ বিষয়ে ইমাম শাফে'য়ী (রাহঃ) থেকে অনেকগুলো উত্তম কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর অনুসারীরা তা সর্বাধিক সুন্দরভাবে আমল করেছেন।

-ইবনু হাযম বলেছেন, যে সকল ফকীহ তাঁর অনুসারীদের অন্ধ অনুকরন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম শাফে'য়ী অন্যতম। তিনি তাকলীদ করতে সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন এবং পরবর্তী লোকদের যে কোন বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'যদি আমি কোন কথা বলি অথচ নবী (সাঃ) আমার কথার বিপরীতে কথা বলেছেন, তাহলে যা, নবী (সাঃ) এর হাদীস দ্বারা সহীহ সাব্যস্ড় সেটাই উত্তম। তোমরা সেক্ষেত্রে আমার (অন্ধ) অনুসরণ করো না। -ইকদুল জীদ, পৃঃ ৫৪।

২। তোমাদের থেকে যেন রাসূলুল-াহ (সাঃ) এর সুন্নাত ছুটে না যায়। আমি যা কিছুই বলে থাকি না কেন তা যদি রাসূল (সাঃ) এর হাদীসের পরিপন্থী হয়, তাহলে রাসূল (সাঃ) এর কথাই আমার কথা। -[তারিখে দিমাশ-ইবনে আসাকির, ইকায পৃঃ১০০ আর ইলামুল মুকেয়ীন, ২য় খ পৃঃ৩৬৩-৩৬৪।]

৩। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কখনো যদি কারো সামনে রাসুল (সাঃ) এর কোন সুন্নাত প্রকাশ পায় তখন তাঁর জন্য অন্য কোন লোকের কথার

ভিত্তিতে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস ত্যাগ করা বৈধ নয়। -[ইবনুল কাইয়ুম ২য় খন্ড পৃঃ৩৬১, আলফেসানি পৃঃ৬৮]

৪। সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সেটাই আমার মাযহাব। -[আল মাজমু আন নাববি আশশারানী,১ম খন্ড পৃঃ৫৭, আল ফোলানী পৃঃ১০৭]

৫। আমি যা বলেছি তাঁর বিপরীত যদি রাসুলুল-াহ (সাঃ) এর কোন হাদীস কারো নিকট বর্তমান থাকে, তাহলে আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই ঐ হাদীসের দিকে ফিরে আসব। -[হিলইইয়া আবু আবু নাঈম,৯ম খন্ড ১০৭ পৃঃ]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহঃ):

ইমামদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ছিলেন সর্বাধিক হাদীস সংগ্রহকারী ও আমলকারী। তিনি আনুষঙ্গিক মাসয়ালা ও রায়ের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন,

১। তোমরা আমার কিংবা ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আওযায়ী বা সুফিয়ান সওরীর তাক্বলীদ (অন্ধ আনুগত্য) করো না। বরং তাঁরা যে উৎস থেকে নির্দেশিকা গ্রহণ করেছেন তুমিও সেই উৎস থেকেই গ্রহণ করো। -[আল ফোলানী, পৃঃ১১৩। ইবনুল কাইয়্যেম-ই'লাম, ২য় খন্ড, পৃঃ৩০২।]

২। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে আমাদের কারো অন্ধ আনুগত্য করো না। রাসুলুল-াহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণ করো। তারপর তাবেয়ীদের কাছ থেকে গ্রহণ করো। তাবে তাবেয়ীদের কাছ থেকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। [আদাব ইবনু আবি হাতিম পৃঃ২৩]

৩। তিনি একবার বলেছেন, "অনুসরণ বলতে বুঝায় রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা মেনে চলা। তারপর তাবেয়ীদের কাছ থেকে বর্ণিত বিষয় মানা বা না মানার ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। -[মাসায়েলে ইমাম আহমদ, পৃঃ২৭৬-২৭৭।]

৪। "ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফার রায় তাদের নিজস্ব রায় বা ইজতিহাদ। আমার কাছে এসবই সমান। তবে দলীল হলো আছার বা সাহাবীগণের কথা ও আদর্শ। -[ইবনু আবদিল বার-জামে, ২য় খন্ড, ১৪৯ পৃঃ।]

৫। "যে ব্যক্তি রাসূলুল-াহ (সাঃ) এর হাদীসকে পরিত্যাগ করে, সে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। -[ইবনুল জাওযী ১৮২ পৃঃ।]

এই হলো হাদীস অনুসরণের নির্দেশ এবং নিজেদের অন্ধ অনুগত্য থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে ইমামগণের বক্তব্য। তাদের বক্তব্যগুলো এতই স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, এর জন্য কোন ব্যাখ্যা-বিশে-ষনের দরকার হয় না কিংবা এতে কোন বিতর্কেরও অবকাশ নেই। তাদের কথার ভিত্তিতে বলা যায় যে, হাদীস অনুসরণের কারণে কোন হাদীস ইমামের বা মাযহাবের বিপরীত হলেও কেউ মাজহাব থেকে বিচ্যুত হয়না। বরং সে নিজ ইমামের মাজহাবেরই অনুসারী থাকে।

কিন্তু কেউ যদি ইমামের কথার দোহাই দিয়ে হাদীসের বিরোধিতা করে, সে কিছুতেই অটুট রজ্জু আকড়ে ধরে নেই। বরং গোড়ামির কারণে সে ইমামদের অবাধ্যই হয় এবং তাদের কথার বিরোধিতা করে।

মাযহাবী অথবা 'আহলে হাদীস" বা 'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ' বা 'ওয়াহাবী' বা 'সালাফী' এসবই মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি ও ফিতনার কারণ। মাযহাবি রা যেমন বিভিন্ন ইমাম এর অনুসরনে একদল আরেকদল এর ইমামতি তে নামাজ পর্যন্ড় পড়তে চায় না, তেমনি আবার যারা সাহিহ সুন্নত অনুযায়ী আমল করছে তারাও নিজেদের সালাফী বা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর দল এ ফেলে নিজেদের কে উচ্চ শ্রেণীর করে ফেলে ভেদাভেদ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তার ফলে মানুষ কিছু শেখার বদলে রেষারেষির জন্ম দিচ্ছে আর বিভেদ করছে। আমরা সবাই মুসলমান, এই আমাদের পরিচয়। রাসুল(সাঃ) আমাদের সবাইকে এক ইসলাম এর ছাতার নিচে এক থাকার উপদেশ দিয়ে গেছেন সবসময়।

মাজহাবের শাব্দিক অর্থ মত বা পথ। পরিভাষায় মাজহাব বলতে বুঝায় শর'য়ী ব্যাখ্যা-বিশে-ষণের ক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদ অর্থাৎ ইমামদের রায় বা মতামতের অনুসরণ করা।

শর'য়ী ব্যাখ্যা-বিশে-ষণের ক্ষেত্রে যার রায় বা মত অনুসরণ করা হোক না কেন তা মুলত কুরআন কিংবা সুন্নাতেরই অনুসরণ- যদি ঐ রায় বা মত সহীহ সূত্রে হয়ে থাকে। যেমন, জামা'তে নামাজ পড়ার সময় যখন ইমামের অনুসরণ করা হয়, তখন তা দৃশ্যত ইমামের অনুসরণ করা হলেও মূলত তা কুরআন এবং সুন্নাহরই অনুসরণ। কারণ ইমাম কুরআন এবং সুন্নাহরই আমল করছেন। তাই কোন মুসিল-ী বলেনা যে, আমি অমুক মসজিদের ইমামের অনুসারী। অনুরূপভাবে মাযহাব হলো কোন শর'য়ী মুজতাহিদের একটি ইনস্টিটিউট বা দ্বীনি গবেষণা মাত্র। আর ঐ মুজতাহিদ ঐ প্রতিষ্ঠানেরই প্রধান বা ইমাম। তিনি যে রায় বা মত প্রদান করেন তা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ীই করেন। তাই কেউ যদি কোন ইমামের রায় বা মত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাকে ঐ ইমামের অনুসারী বলে পরিচয় দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ সে মূলত ইমামের অনুসরণ করছেন না বরং ইমাম কুরআন কিংবা সহীহ সুন্নাহর আলোকে যে রায় বা মত প্রদান করেছেন তারই অনুসরণ করছেন। আর কোন ইমামই নিজের কোন রায় বা মত অপরকে মানতে বাধ্য করেননি। বরং ইমামগণ বলেছেন, "সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় আমার নিজের কোন মত বা রায় মানা যাবেনা"। সুতরাং কোন মাযহাবের ইমামের রায় বা মত যদি ইমামের নিজের না হয়ে থাকে, তাহলে কেউ কোন ইমাম বা মাজহাবের মত গ্রহণ করলে সে মাজহাবী হবে কিভাবে? অতএব শর'য়ী কোন ব্যাখ্যা-বিশে-ষণের মত বা রায় যদি কেউ ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর পক্ষ থেকে গ্রহণ করে থাকেন সে নিজেকে 'হানাফী' বলা, আর কেউ ইমাম আহমাদ হাম্বল (রাহঃ) এর পক্ষ থেকে কোন রায় বা মত গ্রহণ করেছেন বলে নিজেকে 'হাম্বলী' বলা, এ ধরণের পরিচয় মুসলমানদের জন্য রীতিমত একটি ফিতনা। কারণ ইসলামী শরী'য়ার মধ্যে মুসলমানদের ইতিহাসে এ ধরণের পরিচয়ের কোন অস্ড়িত্ব নেই।

আল-াহর রাসূল (সাঃ) এর ইন্ড়েকালের পর খিলাফতে রাশেদীনের মধ্যে যারা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর রায় বা মতের অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা কোন সময় বলেননি যে,

আমরা 'আবু বকরী'। অর্থাৎ আমরা আবু বকরের অনুসারী। আর উমরের সময়ে যারা হযরত উমর (রাঃ) এর মত বা রায় যারা মেনে চলতেন তারা কোন দিন বলেননি যে, আমরা 'উমরী'। অর্থাৎ আমরা উমরের অনুসারী। কারণ তারা কেউ ব্যক্তি আবু বকর বা ব্যক্তি উমরকে অনুসরণ কিংবা মেনে চলেননি। বরং তারা অনুসরণ বা মেনে চলতেন প্রকারান্ড়রে কুরআন ও সুন্নাহকে। আর কুরআন ও সুন্নাহই হলো মুসলমানদের চলার পথে একমাত্র পাথেয়। রাসূলুল-াহ (সাঃ) বলেছেন,- "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা দৃঢ়ভাবে তা ধারণ করে থাকবে, ততক্ষণ তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা। আর তা হলো আল-াহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।

মাজহাবী পরিচয়ের ন্যায় এক্ষেত্রে আবার যারা হাদীস গ্রহণের মূলনীতি উপেক্ষা করে অন্ধভাবে হাদীস মেনে 'আহলে হাদীস' পরিচয় দেন কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত বা কর্মনীতি পরিহার করে সলফে সালেহীনদের অন্ধ অনুসরণ করে যারা 'সালাফী' পরিচয় দেন তাদের এ পরিচয়ও আরেকটি ফিতনা। কারণ এসব পরিচয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ পরিচয় পক্ষ-বিপক্ষ হয়ে পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও নিন্দার ন্যায় জঘন্য অপরাধেরও বিস্ড়ার লাভ হয়েছে পুরো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে। এছড়া কোন কোন স্থানে এক মাযহাবী অপর মাযহাবীকে রীতিমত অস্পৃশ্যও মনে করে থাকেন। এমনকি অনেকেই দুই পক্ষের মধ্যে পরস্পর বিয়ে-শাদীর সম্পর্কও নাজায়েয মনে করে থাকেন। অথচ এসবকিছুই ইসলামী শরীয়ার মধ্যে সম্পুর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়।

যারা বলেন কুরআন মজীদেও ইমাম বা মাজহাব অনুসরণের কথা বলা হয়েছে ও এ কথার দলীল হিসেবে কুরআন নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে থাকেন।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল-াহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর আনুগত্য কর তোমাদের যিনি আমীর, তাঁর।" [সূরা নিসা (৪), ৫৯]

এখানে 'আমীরের আনুগত্য করা' মানে যদি মাজহাবের ইমামের আনুগত্য করা বুঝানো হয় তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, মাজহাব ও ইমাম সৃষ্টি হয়েছে আল-াহর রাসূল (সাঃ) এর ইন্ড়েকালের প্রায় এক শতাব্দী পর। এ পর্যন্ড় সাহাবা কিরাম ও সকল মুসলমানদের মাজহাব কি ছিল এবং তাদের ইমামই বা কে ছিলেন?

বস্ড়ুত উলি-খিত আয়াতে 'আমীরের আনুগত্য করা' মানে মুসলমানদের মধ্যে সকল পর্যায়ে আনুগত্যের শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। উলি-খিত আয়াতে 'উলিল আমর' অর্থ মাজহাবের নির্দিষ্ট কোন ইমাম নয়। বরং সকল ক্ষেত্রে যিনি আমীর অর্থাৎ যিনি হুকুমদাতা তারই আনুগত্য করা। যেমন-দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করা, পরিবারের সবাই পিতা-মাতার আনুগত্য করা, সংগঠনে বা সফরে আমীরের আনুগত্য করা, বিভিন্ন বাহিনীতে কমান্ডারের আনুগত্য করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর প্রধান কিংবা পরিচালকের আনুগত্য করা, নামাজে ইমামের আনুগত্য করা, ছাত্র কতৃক শিক্ষকের আনুগত্য করা ইত্যাদি। তবে এ আনুগত্যও শর্ত সাপেক্ষ। আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রথম হক হলো আল-াহ তাআলার, এর পরেই আনুগত্য করা হবে আল-াহর রাসূলের, অতপর আনুগত্য হবে হুকুমদাতার। এক্ষেত্রে আল-াহ ও রাসূলের আনুগত্য হবে নিঃশর্ত। কিন্তু আমীর কিংবা হুকুমদাতার আনুগত্য হবে শর্ত সাপেক্ষে। অর্থাৎ আমীরের হুকুম যদি কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হয়, তাহলে তা মানা

যাবেনা। বরং কুরআন কিংবা সুন্নাহয় যা বলা হবে তাই মানতে হবে। উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় অংশে তাই বলা হয়েছে। আয়াতটি পুর্ণাঙ্গ হলো-

'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল-াহর আনুগত্য করো এবং রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করো, আর আনুগত্য করো যিনি তোমাদের আমীর, তাঁর। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিতর্ক হয়, তাহলে তা আল-াহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহয় কি বলা হয়েছে সে বিষয়ে তা দেখো)। যদি তোমরা আল-াহ ও পরকালের প্রতি যথাযথ ইমান পোষণ করে থাকো। (এ ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য) এটাই সঠিক ও উত্তম সমাধান। [সূরা নিসা (৪), ৫৯]

এ আয়াতে নির্দিষ্ট কোন মাযহাব কংবা ইমামের আনুগত্য বা অনুসরণ করার কথা বলা হয়নি। বরং এ আয়াতে সকল পর্যায়ের আনুগত্যের উসূল বা নীতিমালাই বর্ণনা করা হয়েছে। যা উপরে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ইমামের অনুসরণ হলো- আবু বকর, উমর ও সকল সাহাবা কিরামের যিনি ইমাম, তিনিই সমস্ড় মুসলমানদের ইমাম অর্থাৎ আল-াহর রাসূল (সাঃ)। কেননা, আল-াহ তাআলা নবী-রাসূলগণকেই একমাত্র সকল মানুষের ইমাম বলে ঘোষনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা তাদেরকে (নবী-রাসূলগণকে) ইমাম বানিয়েছি। তারা আমার হুকুম অনুযায়ী (মানুষ কে) সৎপথে পরিচালিত করে।

এছাড়া যে বিষয়ে আল-াহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে কোন সিদ্ধান্ড় দেওয়া হয়েছে তাঁর উপরে আর কারো সিদ্ধান্ড় দেওয়ার অধিকার নাই।

কোন মুমিন পুর"ষ ও মুমিন মহিলার এ অধিকার নাই যে, আল-াহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেন, তখন সে নিজেই সেই ব্যাপারে কোন ফয়সালা করার এখতিয়ার রাখবে।

দ্বীনের এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে যারা কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন তাদেরকে যারা লা-মাজহাবী বলে নিন্দা করে কিংবা মাজহাব মানে না বলে তিরষ্কার করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে,-সাহাবা কিরাম, তাবি'য়ীন ও তাবে-তাবি'য়ীনদের তো আল-াহর রাসূল ব্যতীত আর কোন ইমাম বা মাজহাব ছিল না। তাহলে কি তারাও লা-মাজহাবী কিংবা কোন মাজহাব না মানার দোষী? অথচ রাসূল (সাঃ) ঐসব লোককে যুগের সর্বোত্তম লোক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন-'আমার সর্বোত্তম উম্মাত হলো তারাই যাঁদের যুগে আমি প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তাদের সাথে যারা মিলিত হবে তারাই। এরপর তাদের সাথে যারা মিলিত হবে তারাই।

অপর বর্ণনায় হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মধ্যে উত্তম কারা? তিনি বলেছেন- 'যে যুগে আমি বিদ্যমান সেই যুগের মানুষ। অতঃপর দ্বিতীয় যুগের মানুষ, এরপর তৃতীয় যুগের মানুষ।

সুতরাং কোন ইমাম বা মাজহাব মানা জর"রী নয়। জর"রী হলো আমল সহীহ করা। আজকে উম্মতের মধ্যে আমলী মতপার্থক্যের একমাত্র কারণ হলো-আমলের ক্ষেত্রে হাদীসের মধ্যে তুলনামুলকভাবে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল না করা এবং হাদীস গ্রহণের মুলনীতি অনুসরণ না করা। হাদীস গ্রহণের মূলনীতির আলোকে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা

হলে আরবী অনারবীর মধ্যে কোন আমলী পার্থক্য থাকার কথা নয়। সহীহ আমলের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমামগণ সবাই একটি কথা বলেছেন- 'আমলের ক্ষেত্রে আমাদের সবার মাজহাব অর্থাৎ মত হলো সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা।

সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা হলে এতে অনুসরণ করা হয় একমাত্র আল-াহর রাসূল (সাঃ) এর। আর আল-াহর রাসূলের (সাঃ) অনুসারীর একক পরিচয় হলো উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ)। এ পরিচয়ের মধ্যে হানাফী, মালেকী, শাফে'য়ী ও হাম্বলী নামে এ উপ পরিচয় যারা মুসলমানদের মধ্যে পোষণ করেন, তারা প্রকারান্তে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভাজনই লালন করেন। একই দোষে দুষ্ট যারা নিজেদেরকে "আহলে হাদীস" বা "সালাফী" প্রমুখ নামে অভিহিত করেন।

যুগে যুগে ইসলামের অনুসারীর নাম "মুসলমান"। ইসলামের অনুসারী ইব্রাহীম (আঃ) এর উম্মতেরও পরিচয় হলো যেমন 'মুসলমান' তেমনি মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতেরও জাতীয় পরিচয় হলো মুসলমান। সুতরাং ইমামগণের সকল অনুসারীর জাতীয় পরিচয় হলো 'মুসলমান'। আর উম্মত হিসাবে আমাদের একক পরিচয় হলো উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ)। এছাড়া ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের অন্য কোন উপ-পরিচয় নেই।

আল-াহ তাআলা বলেছেন,- তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল-াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল-াহ তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছেন পুর্বেও আর এ কুরআনেও। - সূরা নং ২২ আল হজ্জঃ আঃ নং ৭৮।

তোমরা সবাই মিলে আল-াহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না। - সূরা নং ৩ আল ইমরানঃ আঃ নং ১০৩।

চার ইমামের মৃত্যুর কত বছর পর মযহাব সৃষ্টি হয়েছে

প্রসিদ্ধ চার ইমাম	সংকলিত কিতাবের নাম	মৃত্যুর কত বছর পর মাজহাব সৃষ্টি
ইমাম আবু হানীফা নুমান বিন সাবিত (রহঃ), ৮০-১৫০ হিজরী	তাঁর নিজের লেখা বই আছে বলে প্রমাণ নেই	২৫০ বছর পর
ইমাম মালিক বিন আনাস (রাঃ), ৯৩-১৭৯ হিজরী	কিতাবুল মুয়াত্তা	২২১ বছর পর
ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ শাফেঈ (রহঃ), ১৫০-২০৪ হিজরী	কিতাবুল উম্ম	১৯৬ বছর পর
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল(রহঃ), ১৬৪-২৪১ হিজরী	মুসনাদ আহমাদ	১৫৯ বছর পর

ইমাম আবু হানিফা কোন পুস্ড়ক লিখে যাননি, তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ফিকহী কিতাব রচিত হয়েছেঃ

হাদীস, তাসবীহ কিংবা ফিকহ কোন বিষয়েই ইমাম আবু হানীফা কোন কিতাব লিখে যাননি। তিনি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন চিঠি লিখেছেন। ঐ সমস্ড় চিঠির ভিত্তিতে বিভিন্ন পুস্ড়ক প্রকাশিত হয়। যেমন ফিকহুল আকবার।

ইমাম আবু হানীফা তার শিষ্যদেরকে মৌখিক শিক্ষা দান করতেন, তিনি তাঁর কোন কিছুই লিখিয়ে যাননি। [ইসলামী সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৯৬, সামসুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ]

ঈমাম আবূ হানীফার কোন প্রমাণ্য লেখা বর্তমান নেই, হয়ত আদৌ ছিলনা। [সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,পৃষ্ঠা ২৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন ১৯৮২]

কাযী সানাউল-াহ পানিপথী বলেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বর্তমান মাযহাবী পদ্ধতিতে ভাগ হয়ে যায় হিজরী চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীতে। [তাফসীর্ল মাজহাবী]

শাহ ওয়ালীউল-াহ বলেন, চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ড় লোকেরা কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করতনা। [হাজ্জাতুল-াহুল বালীগা]

মাযহাবী তাকলীদীর শুর্র অনেক আগেই সহীহ হাদীস গ্রন্থসমুহ সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু অতিভক্তি ও অন্ধ অনুসরণের জোয়ারে সোনালী যুগের অবসান ঘটিয়ে ধর্মীয় রাজপথ ছেড়ে মাজহাবী লোকেরা চোরাগলির আশ্রয় নিতে শুর্ করে চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমরা নিচে দুটি চার্টের মাধ্যমে একটি তুলনামুলক আলোচনা করার প্রয়াশ পেয়েছি। প্রথমে জেনে নেয়া যাক যে, আবূ হানীফার মৃত্যুর কত বছর পর তাঁর নামে কিংবা তাঁর বরাত দিয়ে তাঁর ভক্ত বা অনুসারীরা বই/পুস্ড়ক রচনা করেছেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইমাম আবু হানীফা ১৫০ হিজরীতে মারা যান। যদি আমরা ধরে নেই যে, পুস্ড়ক রচনাকারীরা তাদের জীবনের শেষ প্রান্ড়ে এসে তাদের পুস্ড়ক রচনা শেষ করেছেন তাহলে ছকের বর্ণনাটি বুঝে নিতে সহজ হবে।

ফিকহী পুস্ড়কের নাম	লেখকের জন্ম-মৃত্যু সন	আবু হানীফার মৃত্যু	আবূ হানীফার মৃত্যুর কত বছর পর বইটি লেখা
কুদুরী	৩৬২-৪২৮ হিজরী	১৫০ হিজরী	২৭৮ বছর পর
হিদায়া	৫১১-৫৯৩ হিজরী	১৫০ হিজরী	৪৪৩ বছর পর
কানযুদ দাকায়িক	৬৪৫-৭১০ হিজরী	১৫০ হিজরী	৫৬০ বছর পর
শরহে বিকায়া	...-৭৪৭ হিজরী	১৫০ হিজরী	৫৯৭ বছর পর
রাদ্দুল মুহতার	৯৩৯-১০০৪ হিজরী	১৫০ হিজরী	৮৫৪ বছর পর
মুসনাদ ইমাম আযম	১০২৫-১০৮৮ হিজরী	১৫০ হিজরী	৯৩৮ বছর পর

তানভির্ল আবসার	১০২৫-১০৮৮ হিজরী	১৫০ হিজরী	৯৩৮ বছর পর
ফতোয়া আলমগীরী	...-১১৩০ হিজরী	১৫০ হিজরী	৯৫৩ বছর পর
শামী	১১৯৮-১২৫২ হিজরী	১৫০ হিজরী	১১০২ বছর পর
তাহাবী শরীফ	২২৯-৩১১ হিজরী	১৫০ হিজরী	১৭১ বছর পর

সহীহ হাদীস সমূহ লিপিবদ্ধ হওয়ার কত বছর পর ফিকহী পুস্ড়ক রচিত হয়েছেঃ

আগেই আমরা উলে- খ করেছি যে, হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ (তাদের ভাষায়) পুস্ড় কগুলোর বহু পুর্বেই সহীহ হাদীসের গ্রন্থগুলো সংকলিত হয়েছে। এবার আসুন দেখা যাক যে, ঐ সব ফিকহী পুস্ড়কগুলো সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হওয়ার কত বছর পর প্রকাশিত হয়েছে। এখানেও আমরা ধরে নিয়েছি যে, পুস্ড়ক রচনাকারীরা তাদের জীবনের শেষ প্রান্ড়ে এসে তাদের পুস্ড়ক রচনা শেষ করেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য আরো উলে- খ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, সহীহ হাদীস মওজুদ থাকা সত্বেও তারা তাদের ফিকহী পুস্ড়কে কোন সহীহ হাদীসের উলে- খ করেননি।

ফিকহী পুস্ড়কের কত বছর আগে সহীহ হাদীস গ্রন্থ সমূহ লেখা হয়েছে তাঁর বর্ণনাঃ

ফিকহী পুস্ড়ক ও	ফিকহী পুস্ড়কের কত বছর আগে প্রধান হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে						
মুয়াত্তা মালিক	সহীহ বুখারী	সহীহ মুসলিম	আবু দাউদ	ইবন মাজাহ	তিরমিযী	নাসাঈ	
কুদুরী(৪২৮)	২৪৯	১৭২	১৬৭	১৬৭	১৫৫	১৪৯	১২৫
হিদায়া(৫৯৩)	৪১৪	৩৩৭	৩৩২	৩৩২	৩২০	৩১৪	২৯০
কানযুদ দাকায়িক (৭১০)	৫৩১	৪৫৪	৪৪৯	৪৪৯	৪৩৭	৪৩১	৪০৭
শরহে বিকায়া (৭৪৭)	৫৬৮	৪৯১	৪৮৫	৪৮৫	৪৭৪	৪৬৮	৪৪৪
রাদ্দুল মুহতার(১০০৪))	৮২৫	৭৪৮	৭৪৩	৭৪৩	৭৩১	৭২৫	৭০১
মুসনাদ ইমাম আযম (১০৮৮)	৯০৯	৮৩২	৮২৭	৮২৭	৮১৫	৮০৯	৭৮৫
তানভির্ল আবসার (১০৮৮)	৯০৯	৮৩২	৮২৭	৮২৭	৮১৫	৮০৯	৭৮৫

ফতোয়া আলমগীরী (১১০৩)	৯২৮	৮৪৭	৮৪২	৮৪২	৮৩০	৮২৪	৮০০
শামী (১২৫২)	১০৭৩	৯৯৬	৯৯১	৯৯১	৯৭৯	৯৭৩	৯৪৮
তাহাবী শরীফ (৩২১)	১৪২	৬৫	৬০	৬০	৪৮	৪২	১৮

বহুল আলোচিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন-উত্তরগুলো ইমাম আশশাওকানী (রাহঃ) এর "তাক্বলীদ", আবু আব্দুল-াহ মুহাম্মদ শহীদুল-াহ খান মাদানী এর "সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) ও চার ইমামের অবস্থান" এবং "আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত?" মুঃ ইকবাল বিন ফখর"ল, থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ১। ইমামদের ফতোয়া কি সুন্নাহ পরিপন্থী হতে পারে?

প্রসিদ্ধ মহামতি চার ইমাম ৮০ হিঃ হতে ২৪১ হিঃ এর মধ্যে পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাদের অধিকাংশের সময়টি ছিল এমন, যখন প্রসিদ্ধ ছয়টি (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ও ইবনু মাজাহ) হাদীস গ্রন্থ পূর্ণ ভাবে সংকলিত হয়নি। বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুমুল-াহ) এর বিদায় মুহূর্তেও ঐ প্রসিদ্ধ হাদীশ গ্রন্থগুলোর সম্পূর্ণ সংকলন হয়নি যার ফলে হাতের নাগালে হাদীস পাওয়া সম্ভব ছিলনা। কিন্তু শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের সাওয়াল জিজ্ঞাসা কখনো বন্ধ ছিল না। আপন আপন এলাকার প্রসিদ্ধ আলিম হিসাবে সম্মুখীন হয়েছেন জটিল প্রশ্নের। কুরআন সহ যার কাছে যত হাদীস ছিল সে আলোকে জবাব দিয়েছেন, এবং হাদীসের অবর্তমানে প্রয়োজনে ইজতেহাদ-গবেষণা করে জবাব দিয়েছেন, ফলে সুন্নাহ পরিপন্থী কিছু ফাতওয়া হওয়াই স্বাভাবিক, যার জ্বলন্ড় প্রমাণ হলো তাদের নির্দেশনা ও সতর্কতা মূলক বক্তব্য সমূহ। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, "আমি যদি কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী কোন ফতওয়া প্রদান করি তাহলে আমার ফতওয়া প্রত্যাখ্যান করো"। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, "আমি যেসব ফতওয়া প্রদান করেছি এর বিপরীত নবী (সাঃ) এর হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে নবী (সাঃ) এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য পাবে, অতএব আমার কোন অন্ধ অনুকরণ করো না"। এ ধরণের সকল ইমামেরই নির্দেশনা। এতে প্রমাণিত হয় ইমামদের কোন কোন ফতওয়া সুন্নাহ পরিপন্থী হতে পারে। তবে তাদের সুন্নাহ বিরোধী ফাতাওয়া কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ও স্বজ্ঞানে ছিলনা।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে, ইমামগণ স্বেচ্ছায় সুন্নাহ বিরোধী ফাতওয়া প্রদান করেননি, এ প্রসঙ্গে বিস্ড়ারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ইমামদের ফাতোয়া হাদীসবিরোধী হওয়ায় দশটি গ্রহণযোগ্য কারণ বর্ণনা করেছেন তাঁর মধ্যে কয়েকটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

প্রথম কারণঃ ইমামের কাছে হাদীস না পৌঁছা। হাদীস না পাওয়ায় চিন্ড়া-গবেষণা করে ফতওয়া প্রদান করেন, পরে এই ফতওয়া অনেক সময় সহীহ হাদীস পরিপন্থী হয়ে যায়। মূলতঃ ইমাম হাদীস পাওয়া স্বত্তেও হাদীস পরিপন্থী ফাতওয়া প্রদান করেননি, যেমনটি বর্তমান মাযহাব পন্থী আলেমরা করে থাকেন।

ইমামদের এরূপ ত্রুটি হওয়া কোন আশ্চয্রের বিষয় নয়, কেননা নবী (সাঃ) এর একান্ড় সাহাবী হওয়ার যারা সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, সকাল-সন্ধ্যা নবী (সাঃ) এর কাছে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাদেরও সকল হাদীস জানা না থাকায় এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেমন আবু বকর (রাঃ), ওমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) সহ অনেক সাহাবী।

দ্বিতীয় কারণঃ ইমামের কাছে সহীহ হাদীস পৌছেছে কিন্তু বিশুদ্ধতায় টিকেনি। অর্থাৎ হাদীস অগ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় ইজতিহাদের আলোকে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। আবার একই হাদীস ভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন সনদে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় কারণঃ ইমাম হাদীস পেয়েছেন, গ্রহণও করেছেন, কিন্তু পরে তা ভুলে গেছেন, ফলে ইজতিহাদ ভিত্তিক ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

চতুর্থ কারণঃ হাদীসের শব্দ ও ভাব কঠিন হওয়ায় বুঝের ভিন্নতার কারণে ফাতওয়া ভিন্নরূপ হয়ে যায়।

পঞ্চম কারণঃ হাদীসের মাঝে কোন দ্বন্দ পরিলক্ষিত হওয়ায় বা মানসুখ (রহিত) মনে করে ভিন্ন ফাতোয়া প্রদান হয়েছিলো।

সুতরাং উপযুক্ত কারণে ইমামদের সুন্নাহ বিরোধী ফাতওয়া হওয়ায় তারা মা'যুর নিরপরাধ। এছাড়া আরো বড় দিক হলো তারা তাদের ফাতওয়ার বিপরীত সহীহ হাদীস প্রমাণিত হলে ফাতওয়া বর্জন করে হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, অতএব সুন্নাহ অনুসরণে তাদের অবস্থান সঠিক ও নির্ভুল। আল-াহ তাআলা তাদের সকলকে জাযায়ে খাইর দান কর ন।

প্রশ্নঃ ২। যেসব বিষয় যুগ যুগ ধরে আমাদের বাপ-দাদা পুর্ব পুর ষরা এক নিয়মে মেনে আসছেন, এখন তা যদি আর এক নিয়মে মানার কথা বলা হয়, তাহলে কি আমাদের মধ্যে একটি ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে না?

উত্তরঃ এ প্রশ্নের উত্তরের প্রথম কথা হলো- এ ধরণের প্রশ্ন কাফের-মুশরিকদের প্রশ্নের মতো। কুরআন মজীদেও একথাটি এভাবেই বলা হয়েছে-"তাদেরকে যখন আল-াহর নাযিল করা বিধানের অনুসরণ করতে বলা হয়, তখনই তারা তাঁর উত্তরে বলে- আমরা তো তা-ই অনুসরণ করবো বা মানবো যা আমাদের বাপ-দাদাকে মানতে দেখছি। (তাদের একথার উপর প্রশ্ন করে আল-াহ তাআলা বলেছেনঃ) তাদের বাপ-দাদারা যদি বুদ্ধিমানের ন্যায় কোন কাজ নাও করে থাকে এবং সঠিক পথে নাও চলে থাকে তবুও কি তারা তাদেরই (বাপ-দাদার) অনুসরণ করতে থাকবে?

সুতরাং কোন বিষয় বেশিদিন ধরে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে কিংবা বাপ-দাদা পুর্ব পুর ষরা করে আসছেন বলে তা সঠিক হয়ে যাবে এমন ধারণা সম্পুর্ণ জাহেলি মুশরিকদের ধারণা। পক্ষান্ড়রে কোন বিষয় তুলনামূলকভাবে সহীহ ও সঠিক বলে প্রমাণিত হলে তা নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে গ্রহণ করা হলো ইমানদারের বৈশিষ্ট। আল-াহ তাআলা বলেছেন,- কোন বিষয়ে ফায়সালার জন্য মুমিনদেরকে যখন আল-াহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তো তাদের কথা হয়- আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। মূলত এসব লোকেরাই হয় সফলতা লাভকারী।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় কথা হলো-কোন বিষয়ে তো ফ্যাসাদ হয় তাদের দ্বারা, যারা ঐ বিষয়ে সত্য স্বীকার করতে চায় না কিংবা যা সহীহ ও সঠিক তা মানতে রাজী হয় না। যারা কোন সহীহ ও সঠিক বিষয় জানে ও মানে তাদের দ্বারা কোন ফ্যাসাদ হয় না।

প্রশ্নঃ ৩। যেসব বিষয় এখন সহীহ ও সঠিক নয় বলে বলা হচ্ছে তা কি ইমাম-মুজতাহিদ কিংবা ফক্বীহ গণ তখন কম বুঝেছেন? এখন যারা বেশি বুঝছে তারা ক'টি কুরআন বা হাদীস জানে?

উত্তরঃ ইমাম-মুজতাহিদ বা ফক্বীহগণ তখন কম বুঝেন নি। তবে বর্তমানের তুলনায় তাদের অবশ্য কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। যেমন বর্তমানে রাসূল (সাঃ) এর কোন হাদীস গ্রন্থবদ্ধের বাইরে নেই। কেউ ইচ্ছে করলে সব হাদীস গ্রন্থাকারে পেতে পারে।শুধু গ্রন্থাকারে নয় এখন সাহিহ হাদীস গ্রন্থ আর জাল হাদীস সব আলাদা আলাদা গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়, শুধু তাই নয় কেন যয়ীফ, কেন জাল আর কেন সহীহ বা হাসান সব সুন্দর করে সাজানো আকারে বই পাওয়া যায়। সে যুগে ইচ্ছা করলেও কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর সব হাদীস একত্রে কারো কাছে সংগ্রহে ছিলনা, বরং তা ছিলো বিভিন্ন জনের কাছে বিচ্ছিন্নভাবে। তাই সব হাদীস জানা কারো পক্ষে সহজসাধ্য ছিলো না। এ সীমাবদ্ধতার কারণেই বড় বড় ইমামগণ এ কথাই বলতেন, যখন কোন বিষয়ে সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তখন সেটাই হবে আমাদের মাজহাব বা মত। এ সহীহ হাদীসের উপর কোন ক্বিয়াস আর কোন যুক্তি-দলীল কারো জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং কোন বিষয়ে সহীহ হাদীস বলা হলে তাঁর মোকাবেলায় কোন ইমাম বা মাজহাবের কথা বলে ঐ বিষয়ের উপর অন্ধভাবে আমল করা যাবেনা। যদি সহীহ হাদীস উপেক্ষা করা ইমাম বা মাজহাবের কথার উপর আমল করা হয়, তাহলে ঐ বিষয়ে তাকে ঐ ইমাম বা মাজহাবেরই উম্মত বলতে হবে। কারণ ঐ বিষয়ে সে রাসূল (সাঃ) কে অনুসরণ না করে ইমাম বা মাজহাবেরই অনুসরণ করে। আর কেউ যদি কোন বিষয়ে রাসূল (সাঃ) কে অনুসরণ করে আবার কোন বিষয়ে অন্ধভাবে কোনো ইমাম বা মাজহাবের অনুসরণ করে, তাহলে সে হবে দ্বৈত উম্মত। অথচ উম্মত বা অনুসারী হতে হবে একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর। কোন মুসলমান অন্য কারো উম্মত বা অনুসারী হতে পারেনা। অন্ধভাবে ইমাম বা মাজহাবের অনুসরণ পক্ষান্তরে যারা দ্বৈত উম্মতে পরিণত হচ্ছে তাদের অনেকেরই এ খবর নেই।

প্রশ্নঃ ৪। দ্বীনের কোন বিষয় সহীহ ও সঠিক হওয়া বা না হওয়া ব্যাপারে দেশের এতগুলা সরকারী-বেসরকারী মাদরাসা আলেম উলামাদের কথা না মেনে নিছক কোন লেখকের কথা মানা কি ঠিক হবে?

উত্তরঃ প্রকৃত দ্বীনের কোন বিষয় সহীহ ও সঠিক হওয়া বা না হওয়া ব্যাপারে দেশের আলেম-উলামারা একেবারে কম বুঝেন তা নয়। তবে উপমহাদেশীয় মাদরাসা শিক্ষায় নীতিগত ও পদ্ধতিগত কিছু বিচ্যুতির কারণে কোন বিষয় সহীহ ও সঠিক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে যাচাই বাছাই করার প্রয়োজন বোধ করেনা। বরং কিতাবে যা আছে তা অন্ধভাবেই বিশ্বাস করেন। তাদের ঐ বিচ্যুতিগুলো হলোঃ

প্রথমতঃ মাদরাসায় যে কিতাবগুলো পড়ানো হয় বিশেষ করে ফিক্বাহর কিতাবগুলোর মধ্যে 'কুদুরী' 'শারহে বেকায়া' ও 'হেদায়া' এসবকে তারা সম্পুর্ণ নির্ভুল বলে বিশ্বাস করেন। অথচ এসব কিতাবে এমন কিছু মাসয়ালাও আছে যা সম্পুর্ণ সহীহ হাদিসের

বিরোধী। সুতরাং এক্ষেত্রে ঐসব কিতাব রচয়িতাদের কোন ভুল বা সীমাবদ্ধতা ছিলনা বলে মনে করা নীতিগতভাবে সঠিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ মাদরাসায় যে হাদীসগুলো পড়ানো হয় অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবানে মাজাহ ও মেশকাত শরীফ এসব হাদীস গ্রন্থের সব হাদীসকে সহীহ বলে বিশ্বাস করা হয়। ফলে কোন বিষয়ে যেকোন হাদিসের উদ্ধৃতি পেলেই তা সহীহ ও সঠিক মনে করা হয়। অথচ 'সহীহ আল-বুখারী' ও 'সহীহ মুসলিম' এ দুই 'সহীহহাইন' ব্যতীত আর পাঁচটি হাদীস গ্রন্থের সব হাদীস সহীহ নয়। বরং এর মধ্যে কোন কোন হাদীস উসূলের মানদন্ডে না পৌঁছার কারণে স্বয়ং হাদীসের ইমামগণও ঐ হাদীস কোন দলীলের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে বলেছেন। তাই এসব হাদীসগ্রন্থের ইমামগণও হাদীসগ্রন্থের নামকরণের ক্ষেত্রে 'সহীহ' ব্যবহার না করে 'সুনান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন 'সহীহ তিরমিযী' বা 'সহীহ নাসায়ী' নামকরণ না করে 'সুনানে তিরমিযী' 'সুনানে নাসায়ী' এভাবে নামকরণ করেছেন। এ নামকরণের মধ্যেই বুঝা যায় যে, এসব হাদীসগ্রন্থের সব হাদীস সহীহ নয়। বরং এতে কোন কোন হাদীস সহীহর বহির্ভুক্তও আছে। তা পরবর্তীতে হাদীসে বিশুদ্ধতা নিরূপনকারী ইমামগণের কাছেও প্রমাণিত হয়েছে যে, এতে কোন কোন হাদীস সহীহর বহির্ভুক্ত আছে তা নয় বরং কোন কোন হাদীস মওযু' অর্থাৎ জাল বলেও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং 'সহীহহাইন' ব্যতীত অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের হাদীস যাচাই না করে দলীলের জন্য গ্রহণ করা তা পদ্ধতিগত ও নীতিগতভাবে সঠিক নয়।

তৃতীয়তঃ মাদরাসায় 'উসুলে তাফসীর' পড়ানো হয় কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ তাফসীর করা শেখার জন্য। 'উসূলে হাদীস' পড়ানো হয় হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপনের জন্য। উসূলে ফিক্বাহ পড়ানো হয় শর'য়ী মাসাইল নির্ভুল হওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্ড়বে তা মানা হয়না। বাস্ড়বে মানা হয় মুফতী, বড় হুজুর, ছোট হুজুর, পীর সাহেব বা মুরব্বীদের কথা।

এখন এসব বাস্ড়বতার ভিত্তিতে যদি কোন ইসলামী গবেষক বা লেখক শর'য়ী উসূল অনুযায়ী প্রচলিত কোন বিষয়কে সহীহ ও সঠিক নয় বলেন, পক্ষান্ড়রে যা সহীহ ও সঠিক তা গ্রহণ না করে অন্ধভাবে কোন আলেম-উলামার কথা মেনে থাকে, তাহলে তা হবে শিরক গুনাহ। কারণ আল-াহ তাআলা বলেছেন,- তারা আল-াহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম-ধর্মযাজকদেরকে নিজেদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ইয়াহুদী-খ্রীস্টানরা নিজেদের ধর্মীয় প্রতিনিধিদের কথা অন্ধভাবে মানার কারণে তাদের এ আচরণকে যেমন আল-াহ তাআলা তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর সাথে শিরক করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, অনুরূপভাবে কুরআন কিংবা কোন সহীহ হাদীসের ভিত্তি ছাড়া আমাদের দ্বীনের আলেম-উলামাদেরকেও যদি অন্ধভাবে মান্য করা হয়, তাহলে তাও হবে তাদেরকে আল-াহ তাআলার সমকক্ষ করার দোষে তথা শিরক গুনাহ করার অপরাধে অপরাধী। এ প্রসঙ্গে হযরত আদি ইবনে হাতিমের ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য। "আদি ইবনে হাতিম যিনি প্রথমে খ্রিস্টান ছিলেন, পরে যখন রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি রাসূল (সাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, কুরআন মজীদে সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে আমাদের আলেম-ধর্মযাজকদেরকে রব বানিয়ে নেওয়ার যে অভিযোগ আমাদের প্রতি করা হয়েছে তাঁর প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, এটা কি সত্য নয় যে, ঐ আলেম-ধর্মযাজকরা যা কিছু হারাম বলতো তোমরা সেগুলোকে অন্ধভাবে হারাম বলে মেনে

নিয়েছো, আর যা কিছু তারা হালাল বলতো সেগুলোকে তোমরা অন্ধভাবে হালাল বলে গন্য করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এরূপ তো আমরা অবশ্যই করেছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, বেশ, এর অর্থ হলো তাদেরকে 'রব' বলে মান্য করা।

প্রশ্নঃ ৫। দ্বীনের সব আমলই সহীহভাবে করতে হবে একথা সঠিক। কিন্তু যেখানে দ্বীন কায়েম নেই সেখানে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনই সবচেয়ে বড়। এখন যদি আমল সহীহ নিয়ে বিতর্কে যাই তাহলে কি দ্বীনি আন্দোলনের ক্ষতি হবে না?

উত্তরঃ এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কথা হলো, আমল সহীহ করা নিয়ে বিতর্ক হবে কেন? কোন বিষয়ে বিতর্ক তো তখনই হয় যখন ঐ বিষয় অপরকে মানার জন্য বাধ্য করা হয়। কেউ নিজের আমল নিজে সহীহ করলে বিতর্ক হবার কি আছে। আর কেউ সহীহ আমল নিয়ে প্রশ্ন তুললে সুন্দরভাবে যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) ও যে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে বলেছেন তা তাকে শুনাতে হবে। কেউ গায়ে পড়ে বিতর্ক করতে চাইলে তা এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা, হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত কোন ভুল একদিনেই তো শুদ্ধ করা যাবেনা।

দ্বিতীয় কথা হলো- ইক্বামাতে দ্বীন মানে তো শুধু ক্ষমতার আসন লাভ করা নয়। ইক্বামাতে দ্বীন মানে দ্বীনের মধ্যে সকল কুসংস্কার ও সর্বপ্রকার ভ্রান্ড় বিশ্বাসের সংস্কার করা, সকল ভুল আমল সহীহ করা, তা ইবাদাতের ক্ষেত্রে হোক কিংবা মুয়াশরাত বা প্রশাসনের ক্ষেত্রে হোক। যাঁদের আমল সহীহ নয় তাদের দ্বারা ইক্বামাতে দ্বীনের আন্দোলন বাস্ড় বায়নও সম্ভব নয়। কারণ আল-াহর কাছে গ্রহণযোগ্য আমল ব্যতীত কেউ আল-াহর মেহেরবাণী লাভ করতে পারেননা। আর আল-াহর মেহেরবাণী না হলে তো ইক্বামাতে দ্বীনও সম্ভব নয়। তাই কোন ভুল আমল অর্থাৎ যা আল-াহর রাসূল (সাঃ) করেননি কিংবা তিনি করতে বলেননি এমন কোন আমল আল-াহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,- যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যা আমাদের থেকে করতে বলা হয়নি তা প্রত্যাখ্যাত অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং অন্ধভাবে কোন মাজহাবের অনুসরণ করে সহীহ আমল বাদ দিয়ে দুনিয়াতে না ইক্বামাতে দ্বীন বাস্ড়বায়ন সম্ভব, আর না আখিরাতে মুক্তিলাভ সম্ভব।

বিদ'আত

এই অধ্যায়্যের অংশটুকু 'বিদআত'-ড. আহমদ আলী, 'ইবাদাতের নামে শিরক ও বিদা'ত'-আবুল কালাম আযাদ, 'বিদআত ও প্রচলিত কুসংস্কার'-সাজ্জাদ সালাদীন, রাসূল (সাঃ) এর সালাত ও রাত্রি দিনের যিকির'-সংকলন ইউসূফ ইয়াসীন, 'শবে বরাত-সঠিক দৃষ্টিকোন'-আব্দুল-াহ শহীদ আব্দুর রহমান এবং সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোর বিদআত অধ্যায় থেকে সংকলিত হাদীসসমূহ দ্বারা সাজানো হয়েছে।

ইমাম মালিক (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে নতুন কোন বিষয় উদ্ভাবন করে মনে করে যে, তা উত্তম, তাহলে সে প্রকারান্ড়রে এ ধারণা করল যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রতি আরোপিত রিসালাতের দ্বায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল-াহ তাআলা বলেছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পুর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের

প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পুর্ণ করলাম ও ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদাহ ৫৩)।

অতএব তখন যেসব বিষয় দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলোনা, আজকের দিনেও তা অন্তর্ভুক্ত হবে না।" দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত হচ্ছে ঐ সমস্ত আমল যে আমলের ব্যাপারে শরীয়তের কোন হুকুম বা দলীল নেই। আল-াহ তাআলা বিদ'আত সম্পর্কে বলেন-তাদের কি এমন কতগুলি শরীক আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল-াহ দেননি (সূরা শুরা ৪২:২১)।

'বিদ'আত' শব্দটির অর্থ হলো-পুর্ব নমূনা ব্যাতিরেকে নতুন ভাবে কোন বস্তু বা বিষয় উদ্ভাবন করা (innovation)।

মহান আল-াহ বলেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তবে আল-াহ ও রাসূলের দিকে প্রবর্তিত হও"। [সূরা আন-নিসাঃ ৫৯]

তিনি অন্যত্র বলেন, "আর এ পথই আমার সরল পথ, এ পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এ পথ ছাড়া অন্যান্য কোন পথ অনুসরণ করে চলবে না, করলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে"। [সূরা আল-আন'আমঃ ১৫৩]

রাসুল(সাঃ) এর বিদায়ী হাজ্জ এর দিনে আল-াহতায়ালা ঘোষণা করেছেন-

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের "দ্বীন" কে পরিপুর্ন করে দিলাম। [সূরা মাইদা-আয়াত ৩]।

আল-াহতায়ালা আরো বলেন, "রাসুল(সাঃ) তোমাদের যা দিয়েছেন তা-ই তোমরা গ্রহণ করো আর যা বারণ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।[সূরা হাশর-আয়াত ৭]।

হাদিসে আছে-

(১) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল-াহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, যা তাঁর আওতাভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত"। [সহীহ। বুখারী ২৬৯৭ ও মুসলিম ১৭১৮]

সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, সে বিষয়ে আমাদের নির্দেশ নেই, তা অগ্রহণীয়।

(২) আবূ নাযিহ ইরবায বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "একদিন রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনালেন, যাতে আমাদের সকলের চোখে পানি এল এবং অন্তর প্রকম্পিত হল। আমরা বললাম, হে আল-াহর রাসূল! এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নসিহতের মত মনে হচ্ছে। অতএব আমাদেরকে উপদেশ দেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল-াহকে ভয় করার এবং (নেতৃআদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে নেতা বা শাসনকর্তা হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে। আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের যারা জীবিত থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। সুতরাং আমার সুন্নাত ও সৎপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। তোমরা ধর্মের ব্যাপারে নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত থাকা হতে দূরে থাকবে।

কেননা প্রতিটি বিদ'আতই (দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন) পথভ্রষ্টতা। [সহীহ। আবু দাউদ ৪৬০৭, ও তিরমিযী ২৬৭৮ ইমাম তিরমিযী]

(৩) বিদা'ত শব্দের অর্থ নবোদ্ভাবন বা নতুন সৃষ্টি। শরী'আতের পরিভাষায় বিদা'তের পরিচয় হলো-দ্বীনদারী কিংবা আমল ও ইবাদাতের নামে নব উদ্ভাবিত এমন সব কাজ, যা রাসূল (সাঃ) কোন সময় করেন নি এবং যার কোন নমূনা সাহাবা কিরাম কিংবা তাবেইনদের যুগেও পাওয়া যায় নি। সুতরাং যে দ্বীনদারী কিংবা ইবাদাতের নমূনা আল-াহর রাসূল (সাঃ) কিংবা সাহাবা কিরাম অথবা তাবেইনদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না, তা কোন দ্বীনদারীও নয় এবং নয় কোন ইবাদাতও। বিদা'তের কয়েকটি সহজ পরিচয় হলো বিদা'ত সুন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত, সুন্নাতের একরূপ বিদা'তের বহুরূপ, সুন্নাত আল-াহর রাসূল (সাঃ) থেকে অনুসৃত। আর বিদা'ত ব্যক্তি বিশেষ কতৃক উদ্ভাবিত। তাই এ বিদা'তের ব্যাপারে আল-াহর রাসূল (সাঃ) কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন,-যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করল যা মূলত এর অন্ড়র্ভুক্ত নয়, তা অগ্রাহ্য। [সহীহ। বুখারী হাঃ নং ২৫০১, মুসলিম হাঃ নং ৪৩৪৩]

(৪) যে ব্যক্তি আমাদের আমল ইবাদাত ব্যতীত অন্য কোন আমল ইবাদাত আবিষ্কার করলো, তা প্রত্যাখাত বা গ্রহণযোগ্য নয়।[সহীহ। আবু দাউদ হা/৪৬০৬]

(৫) যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনী কাজের উপর অন্য কোন কাজ আবিষ্কার করল তা হবে অগ্রাহ্য। অর্থাৎ তা গ্রহণযোগ্য হবে না। [সহীহ।আবু দাউদ হাঃ নং ৪৩৪৪]

(৬) তিনি আরো বলেছেন, সাবধান! তোমরা (আমল ও ইবাদাতে) নতুন কিছু করা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যক নতুন কিছু করার নামই বিদা'ত, আর প্রত্যেক বিদা'তই গোমরাহী তথা ভ্রান্ড়। [সহীহ। আবু দাউদ হাঃ নং ৪৬০৭]

(৭) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (আমল ও ইবাদাতে) কোন নতুন কাজ করল অথবা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় তথা সহযোগীতা করে, তাঁর উপর আল-াহর লা'নত, ফেরেশতা এবং সমস্ড় মানুষের লা'নত (অভিশাপ), তাঁর কোন ফরজ ও নফল ইবাদাত কবুল করা হবে না। [বুখারী হাঃ নং ৬৭৯০]

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, আল-াহ তাআলা প্রত্যেক বিদ'আতীর তাওবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন যতক্ষন না তারা বিদা'ত পরিত্যাগ করে। [ত্বাবারানী, আততারগীব ওয়াত তারহীব সূত্রে]

শুধু তাই নয় বিদ'আত কারীকে যারা সাহায্য সহযোগীতা করে তাদেরকেও অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল-াহ তাআলা অভিশপ্ত করেছেন সে ব্যক্তিকে যে বিদ'আতকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় তথা সাহায্য-সহযোগীতা দিয়েছে। [মুসলিম]

বিদা'তকারীদের নিন্দা করতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদা'তকারীকে সম্মান করল সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সাহায্য করল। [বায়হাকী]

(৮) রাসুলুল-াহ (সাঃ) তাঁর খুতবায় আল-াহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বলতেন, আল-াহ তাআলা যাকে হেদায়াত দান করেন তাঁর কোন গোমরাহকারী নেই, আর তিনি যাকে গোমরাহ করেন তাঁর কোন হেদায়াতকারী নেই। অবশ্যই সবচেয়ে সত্য কথা

হলো আল-াহর কিতাবের কথা। আর সবচেয়ে উত্তম হেদায়াতের পথ হলো মুহাম্মদের (সা:) প্রদর্শিত পথ। নিকৃষ্ট কাজ সমূহ হল (আমল ও ইবাদাতের মধ্যে) নব উদ্ভাবনসমূহ। আর প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত কাজই হল বিদা'ত। আর প্রত্যেক বিদা'তই হল গোমরাহী তথা বিপথগামীতা এবং প্রত্যেক বিপথগামীই হবে জাহান্নামী। [সহীহ। নাসাঈ হাঃ নং ১৫৭৮]

(৯) বিদা'তের বাস্ড়ব পরিণতি সম্পর্কে হযরত ওমর ফার"ক (রাঃ) ও হযরত আব্দুল-াহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমরা (আমল ও ইবাদাতের মধ্যে) অচিরেই নতুন কিছু উদ্ভাবন করে বসবে। আর তোমাদের জন্য উদ্ভাবিত হবে অনেক নতুন নতুন জিনিস। তবে জেনে রাখ, সব নবোদ্ভাবিত জিনিসই সুস্পষ্ট গোমরাহীর মূল। আর সব গোমরাহীরই চূড়ান্ড় পরিণতি জাহান্নাম। [আল ইতাছ্বাম]

(১০) হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, একদা তিনি দুটি পাথর নিয়ে একটিকে অপরটির উপর রেখে সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা পাথর দুটির মাঝখানে কি কোন আলো দেখতে পাচ্ছো? তারা তখন বললেন, আবু আব্দিল-াহ, আমরা পাথর দুটির মাঝখানে কেবল সামান্যটুকুন আলোই দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, "যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! অচিরেই বিদ'আত এভাবে প্রকাশ হবে যে এর মাঝে সত্যের আলো কেবল পাথর দুটির মধ্যবর্তী আলোর মতই ম্রিয়মান অবস্থায় দেখা যাবে। আল-াহর শপথ! বিদা'তের এভাবে প্রাধান্য ও ছড়াছড়ি হবে যে, কেউ যদি এর কোন অংশও ছেড়ে দেয়, তাহলে লোকেরা বলাবলি করবে যে, তুনি সুন্নাত পরিত্যাগ করেছো। [ইবনু ওয়াদ্দাহ, আল-বিদাউ, হাঃ নং ১৪৯, শাতিবী, আল-ইতিসাম। খ ১, পৃঃ ৭৮]

(১১) বর্ণিত রয়েছে রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন সুন্নাতকে পুনর"জ্জীবিত করবে, যা আমার মৃত্যুর পরে নিষ্প্রাণ তথা অস্থিত্বহীন হয়ে হয়ে গিয়েছিল, সে তাদের আমলেরও সমপরিমান সাওয়াব লাভ করবে, যারা তাকে দেখে উক্ত সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে, এমতাবস্থায় তাদের সাওয়াবে কোন প্রকারের হ্রাস করা হবে না। [সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুল ইলম), হাঃ নং ২৬৭৭, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান (বাবঃতা'যীমু হাদীসি রাসুলুল-াহ (সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম)) হাঃ নং ২১০; তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর (বাবুল আয়ন) হাঃ নং ১০]

হাদীসে আরো এসেছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমাদের (ইসলামের) নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত। [মুসলিম]

এ হাদীসে 'যার প্রতি নির্দেশ নেই' বাক্যটি দ্বারা একথাটি বুঝানো হয়েছে যে, বিষয়টি ধর্মীয় হতে হবে। ধর্মীয় বিষয় হিসাবে কোন নতুন আমল করলেই বিদাআত হবে। যারা মাইকে আযান দেন তারা জানেন যে, মাইকে আযান দেওয়ার আলাদা কোন মর্যাদা নেই বা আযানে মাইক ব্যবহার করা সওয়াবের কাজ বলে তারা মনে করেন না। এমনিভাবে বিমানে হজ্বে যাওয়া, প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা প্রচলন, মোবাইলে কুরান পড়া, টিভি তে ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখা প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন উন্নত মাধ্যম, কিন্তু ধর্মীয় বিষয় বলে গণ্য করা হয় না। তাই তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অনেকে এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিদ'আতকে দুই ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেন। বিদা'তে হাসানাহ ও বিদা'তে সাইয়েয়াহ। সত্যি কথা হলো বিদা'আতকে এভাবে

ভাগ করাটা হল আরেকটি বিদা'আত এবং তা হাদীসে রাসূল (সাঃ) এর পরিপন্থী। কেননা রাসূলুল-াহ (সাঃ) বলেছেন, সকল নব-আবিষ্কৃত (দ্বীনের মধ্যে) বিষয় হতে সাবধান! কেননা প্রত্যেকটি নব-আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত, আর প্রত্যেকটি বিদ'আতই হল পথভ্রষ্টতা। [আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী]

তাই বিদা'তে হাসানাহ বলে কোন কিছু নেই। আল-াহর রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন আমরা তাই বলব, সকল প্রকার বিদ'আত গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।

আল-াহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ইসলামে কোন ভাল পদ্ধতি প্রচলন করল সে উহার সাওয়াব পাবে এবং সেই পদ্ধতি অনুযায়ী যারা কাজ করবে তাদের সাওয়াবও সে পাবে, তাতে তাদের সাওয়াবে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ পদ্ধতি প্রবর্তন করবে সে উহার পাপ বহন করবে, এবং যারা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করবে তাদের পাপও সে বহন করবে। তাতে তাদের পাপের কোন কমতি হবে না। [মুসলিম]

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, শবে বরাত উদযাপন, মীলাদ মাহফিল, মীলাদুন্নবী প্রভৃতি আচার-অনুষ্টানকে কি সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গণ্য করা যায় না? মাইকে আযান দেওয়া, মাদ্রাসা পদ্ধতি প্রচলন, আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা ইত্যাদি কাজগুলো যদি সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে শবে বরাত, মিলাদ ইত্যাদিকে কেন সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না?

পুর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিদা'আত হবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে। যদি নতুন কাজটি ধর্মের অংশ মনে করে অথবা সওয়াব লাভের আশায় করা হয়, তাহলে তা বিদা'আত হওয়ার প্রশ্ন আসে। আর যদি কাজটি ধর্মীয় হিসাবে নয় পদ্ধতি হিসাবে করা হয় তাহলে তা বিদা'আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। যেমন ধরুন মাইকে আযান দেওয়া। কেহ মনে করেনা যে, মাইকে আযান দিলে সাওয়াব বেশী হয় অথবা মাইক ছাড়া আযান দিলে সাওয়াব হবে না। তাই সালাত ও আযানের ক্ষেত্রে মাইক ব্যবহার করাকে বিদা'আত বলা যায় না।

তাই বলতে হয় বিদা'আত ও সুন্নাতে হাসানাহ এর মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, কোন কোন নতুন কাজ ধর্মীয় ও সাওয়াব লাভের নিয়্যত হিসাবে করা হয় আবার কোন কোন নতুন কাজ দ্বীনি কাজ ও সাওয়াবের নিয়্যতে করা হয় না বরং সংশি-ষ্ট কাজটি সহজে সম্পাদন করার জন্য একটা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত বিদ'আতসমূহঃ

১। শবে বরাত, শবে মিরাজ ও ঈদে মিলাদুন্নবী ঘটা করে পালন করা এবং এই সব দিনের জন্য বিশেষ ধরণের নামাজের বা ইবাদাতের প্রচলন এবং বিশেষ খাওয়া দাওয়া, আলোকসজ্জা, কার্যাবলী, বাজি, পটকা ফোটানো এসমস্ড় কিছু বিদ'আত।

২। আজান দেওয়ার পূর্বে সালাত ও সালাম পেশ করা বিদ'আত। প্রকৃতপক্ষে সুন্নাত হলো আযানের পরেই দু'আ পড়া। (সূত্রঃ মুসলিম হা নং ৭৩৫, আবু দাউদ হা নং ৫২৩, নাসাঈ হা নং ৬৭৯)

৩। আযান দেওয়ার সময় বা রাসূল (সাঃ) এর নাম শুনলে শাহাদাত আঙ্গুল বা বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় চুম্বন করে দুই চোখে লাগানো এটাও একটা বিদ'আত। কারণ এ সম্পর্কিত প্রচলিত হাদীসগুলো সকল হাদীস বিশারদগণই জাল বলেছেন। (সূত্রঃ যইফ ও মওযু

হাদীস-আলবানী, আল মাকসুদুল হাসানাহ পৃঃ৬০৫, আল ফাওয়াইদুল মাজমু'য়াহ ফীল আহদীলীল মাযমু'আহ পৃঃ২৩, ইসমাঈল বিন মুহম্মদ আল জায়াহী, কাশফুল খাফা হা/২০৬পৃঃ, তাযকিরাতুল মাওযু'আত পৃঃ৩৪)

৪। নামাজ শুর করার পূর্বে জায়নামাজে বা নামাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে "ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়্যা" এই দু'আ পড়া বিদ'আত। কারণ রাসুলুল-াহ (সাঃ) নামাজ শুর করার পূর্বে জায়নামাজে বা নামাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে "আল-াহু আকবার" বা "তাকবীর তাহরীমা" ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে সালাত শুর করেছেন বলে কোন হাদীসে তাঁর প্রমাণ নেই। (সালাত অধ্যায়ে বিস্ড়রিত বর্ণনা আছে)

৫। আরবী বা নিজের মাতৃভাষায় মুখে উচ্চারণ করে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে নামাজের জন্য নিয়ত পড়া বিদ'আত।

নামাজের জন্য 'নিয়্যত' করা ফরজ বটে, তবে আরবী বা নিজের মাতৃভাষায় তা মুখে উচ্চারণ করে নয়। বরং তা হবে মনে মনে স্থির করে নেয়া যে আমি কি পড়তে যাচ্ছি এবং নামাজের জন্য দাড়ানোর পূর্বেই। কারণ রাসুল (সাঃ) নামাজে দাঁড়িয়ে মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করে পড়েছেন এমন কোন প্রমাণ কোন জাল হাদিসেও বর্ণিত হয়নি। যারা বলেন-"নিয়্যত মনে মনে করতে হয় ঠিক, তবে আরবী বা নিজের মাতৃভাষায় বলা উত্তম" একথা সম্পুর্ণ অযৌক্তিক। কারণ কোন আমল বা ইবাদাতের জন্য যা উত্তম অথচ আল-াহর রাসূল (সাঃ) কিংবা সাহাবা কিরামগণ তা বর্ণনা করেন নি এমন কোন বিষয় বাকী নেই। সুতরাং রাসুলুল-াহ (সাঃ) কিংবা সাহাবা কিরাম যা উত্তম মনে করেন নি, উম্মতের মধ্যে আর উত্তম মনে করার প্রশ্নই উঠে না। অতএব যে আমল বা ইবাদাতের পূর্ব নমুনা নেই তা সন্দেহাতীতভাবে বিদ'আত। (সালাত অধ্যায়ে বিস্ড়রিত প্রমাণাদি আছে)।

৬। জামা'তের সাথে নামাজ শেষে ইমাম কতৃক সম্মিলিত কণ্ঠে সালাত ও সালাম পাঠ করা, সূরা হাশরের শেষ র কু, দু'আ দর দ ইত্যাদি সম্মিলিত পাঠ করা ও সম্মিলিত মুনাজাত করা বিদ'আত। কারণ রাসূল (সাঃ) নামাজ শেষে এভাবে সম্মিলিত কিছু পাঠ করেন নি এবং করতে বলেন নি। বরং তিনি জামাতে নামাজ শেষ করে যা পড়তেন তা নিজে নিজে পড়তেন এবং যা পড়তে বলেছেন তা হাদীসে বর্ণিত আছে।

(সালাত অধ্যায়ে বিস্ড়রিত হাদীস প্রমাণাদি ও রাসুল(সাঃ) থেকে প্রমাণিত যিকির সমুহ বর্ণিত আছে)।

৭। জানাজার নামাজ পড়ার পর পুনরায় সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা বিদ'আত। কারণ এভাবে রাসূল (সাঃ) কোন দু'আ বা মুনাজাত করেছেন বলে প্রমাণ নেই। অধিকন্তু জানাজার নামাজটাই হলো নামাজের ভঙ্গিতে একটি বিশেষ দু'আ। সুতরাং রাসূল (সাঃ) যে আমলটি যেভাবে করেছেন তা সেভাবে করাই সুন্নাত। তাঁর উপর সে বিষয়ে কোন অতিরিক্ত আমল করা সেটাই হলো বিদ'আত।

৮। রাত্রে সাহারী খাওয়ার পর মুখে উচ্চারণ করে আরবীতে কিংবা মাতৃভাষায় নিয়্যত পড়াও একটি বিদ'আত। নিয়্যত সম্পুর্ণ মনের ব্যাপার। মুখে নিয়্যত বলে মনে মনে রোযা না রাখার খেয়ালে রাত্রে কেউ সেহেরী খেলেও রোযা হবে না। বইপত্রে আরবীতে যে নিয়্যত দেখা যায় তা কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত, এটা আল-াহর রাসূল (সাঃ) এর বর্ণিত কোন

হাদীস নয়। অধিকন্তু যারা নামাজ ও রোযার নিয়্যত রচনা করাচ্ছেন তারা হজ্জ, কুরবানী ও যাকাতের নিয়্যতও রচনা করেন নি। নিয়্যত মুখে বলতে হলে হজ্জ, কুরবানী ও যাকাতের নিয়্যত মুখে বলতে হবেনা কেন? সুতরাং যে কোন আমলের জন্য নিয়্যত করতে হবে মনে মনে, মুখে বলে নয়। মুখে নিয়্যত বললে তা হবে বিদ'আত। কারণ রাসুলুল-াহ (সাঃ) কোন আমলের জন্য মুখে নিয়্যত বলতে শিক্ষা দেননি।

৯। মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনার নামে তাহলীল পড়া ও কুরআন খতম পড়ানো, মৃত ব্যক্তির চারপাশে বসে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত।

১০। মৃত ব্যক্তির কাযা নামাজ থাকলে কিংবা মৃত ব্যক্তি বেনামাজি হলে তাঁর নামাজের আর্থিক কাফফারা হিসাব করে কাফফারা আদায় করা এবং এ মৃত ব্যক্তি গরীব লোক হলে কাফফারার পরিবর্তে একটি কুরআন মাজীদ কাউকে হাদীয়া প্রদান করে কাফফারা এসক্বাত্ব (দূরীভূত) ইত্যাদি বিদ'আত।

১১। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ৪র্থ দিনে বা তাঁর আগে ও পরে চারদিন্না ফাতিহা কিংবা কুলখনি নামে নানারকম ফলাহারের ফাতিহার আয়োজন করা, তা বিতরণ করা ও ঐ দিনে মেজবানের ব্যবস্থা করা। আর মৃত ব্যক্তি বড়লোক ও নেতাগোছের হলে উলে-খযোগ্য সংখ্যক গর"-মহিষ দিয়ে খ্যাতি জুড়ানো মেজবান দেওয়া।

১২। মৃত্যুর পনের তারিখে তাওয়া ফাতিহার (তাওয়ায় সেঁকা র"টি দিয়ে ফাতিহা) আয়োজন করা এবং পাঁচ বা সাত মসজিদে জুমার দিন তা বিলি করা।

১৩। মৃত্যুর চলি-শ দিনে চলি-শা বা চেহলাম পালন করা এবং ঐ দিন খানাপিনার আয়োজন করা।

১৪। মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা ও ঐদিন মিলাদ পাঠ করানো, মেজবানের ব্যবস্থা করা কিংবা কাঙ্গালীভোজের অনুষ্ঠান করা অথবা কুরআন-খানি, খতমে কুরআন বা খতমে বুখারী পড়ানো। ছোট কিংবা বড় আকারে ইছ্বালে সাওয়াবের মাহফিল করা বা ওরশ করা বা ঐদিন কবরে পুষ্পস্ড়বক অর্পণ করা।

১৫। পীর, পীর-মুরিদ, মাযার যিয়ারত, ওরশ এবং পীরের বানানো তরিকা, তাসবীহ, তা'লীম পাঠ, পীরের বায়াত গ্রহণ এবং আর যা কিছু পীর কেন্দ্রিক কর্মকা" ইসলামে সম্পুর্ণ বিদ'আত ও শিরকের সমতুল্য। [এ ব্যাপারে বিস্ড়ারিত জানতে পড়ুন- হাফিজ মোঃ আইয়ুব বিন ইদু মিয়ার "পীর ফকির ও কবর পূজা কেন হারাম?"]. এ সম্পর্কে হাদীস-জাবের(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল(সাঃ) কবর পাকা করতে, কবর এর উপর বসতে আর কবর এর উপর ইমারাত নির্মান করতে বারণ করতেন।[সহীহ। মুঃ ৯৭০, তিঃ ১০৫৭, নাসায়ী ২০২৭-২০২৯, আঃদাঃ ৩২২৫, ইঃমাঃ ১৫৬২,১৫৬৩]। মক্কায় জান্নাতুল বাকীতে গেলে দেখবেন সমস্ড় সাহাবীদের কবরে শুধু একটি করে পাথর গাঁথা, কোন নাম ফলক নেই।

বিদ'আতের কুফল

১। হাওযে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবেঃ

হযরত আব্দুল-াহ ইবনে মাসউদ ও সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল-াহ (সাঃ) বলেছেন, হাশরের ময়দানে আমি আমার উম্মতকে পেয়ালা ভরে ভরে হাওযে কাওছারের পানি পান করাব। লোকেরা একদিক থেকে আসতে থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে অপর দিকে সরে যেতে থাকবে। এসময় আমার উম্মতের কিছু লোক আমার দিকে আসতে থাকবে, কিন্তু তাঁদেরকে আমার কাছে আসতে বাধা দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় আমি দাবী করা বারংবার বলবো, ইয়া রাব্ব, এরা তো আমার উম্মাত! এরা তো আমার উম্মাত! এদের আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? তখন আমাকে জানানো হবে, "এই লোকেরা আপনার ইন্ড়িকালের পর দ্বীনের মধ্যে কি কি নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছে, তা তো আপনি জানেন না"। এরা তো আপনার রেখে আসা দ্বীনকে বদলে দিয়েছে, বিকৃত করেছে। একথা শুনে আমি তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো, "দূর হয়ে যাও! যারা আমার দ্বীনকে আমার ইন্ড়িকালের পর বিগড়ে দিয়েছো, তোমরা দূর হয়ে যাও! আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও! বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল রিকাক), হা নং ৬২০৫, ৬২১১, ৬২১২, (কিতাবুল ফিতান), ৬৬৪২, মুসলিম, আস-সহীহ, (কিতাবুল ফাদা'ইল) হা নং ৫৯৩০, ৫৯৩৪, ৫৯৫১, ইবনু খুযায়মাহ, আস-সহীহ, (কিতাবুল ওযু), হা নং ৬, আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা নং ৩৬৩২, ৩৮০২, ৩৮৪০, ৩৮৫৬, ৪০৩২, ৪১৬৯, ৪৩২০, ৪৩৩৮, ১০৮৩৬।

২। রাসূল (সাঃ) বলেন, শোন! তোমরা নতুন ভাবে উদ্ভাবিত নিকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। কেননা নিকৃষ্ট কাজ হলো দ্বীনের মাঝে উদ্ভাবিত নতুন বিষয়। প্রতিটি নতুন নিকৃষ্ট বিষয় উদ্ভাবন হচ্ছে বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। সহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪৬, বুঃ ৬০৯৪, মুঃ ২৬০৬, ২৬০৭/১-৩, তিঃ ১৯৭১, আঃ দাঃ ৪৯৮৯, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, ৪০১২, দারিমী ২৭১৫।

৩। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে কোন মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করলো, সে মিথ্যাবাদী। [সহীহ। ইঃ মাঃ ১/৩৮, ২/৩৯, তিরমিযী ২৬৬২, আহমাদ ১৯৬৫০, ১৯৭০৯, ১৯৭১২, ৯০৫,]

অপর বর্ণনায়- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তাঁর আবাস নির্ধারণ করলো। সহীহ ইঃ মাঃ ৮/৩৭, ৭/৩৬, মুঃ ৩০০৪, আঃ ১০৯৫১, ১১০১১, ১১০৩২, ১১১৪২, বুঃ ১০৭, আঃ দাঃ ৩৬৫১, আহমাদ ১৪১৬, ১৪৩১, দারিমী ২৩৩।

২। রাসূলুল-াহ (সাঃ) এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হবে-

যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর অনুসৃত সুন্নাত পরিহার করে নিজের বা অন্য কারো রচিত পথ অনুসরণ করা চলবে, তাদের প্রতি রাসূল (সাঃ) ভারী অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের সাথে তাঁর কোন রকমের সম্পর্কই বজায় থাকবেনা। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অবজ্ঞা করবে, সে মূলত আমার দলভুক্তই নয়" [বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল নিকাহ), হা নং ৪৬৭৫,মুসলিম, আস-সহীহ, (কিতাবুল নিকাহ) হা নং ২৪৮৭]

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ (সাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে আয়িশা, প্রত্যেক প্রকারের পাপের তাওবা রয়েছে। তবে প্রবৃত্তি পুজারী ও

বিদ'আতীদের তাওবার কোন সুযোগ নেই। আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাদের সাথে আমারও কোন সম্পর্ক নেই"। [বায়হাক্বী, শু'আবুল ইমান, হা নং ৭২৩৯; তাবারানী, আল-মু'কামুস সাগীর, হা নং ৫৬১।]

বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত উমার (রাঃ) কে কাদরিয়্যাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাদের সাথে নিজের সম্পর্কহীনতার কথা জানিয়ে বললেন, "তাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই নেই এবং তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই"। [মুসলিম (কিতাবুল ঈমান) হা নং ৯; আবু দাউদ আস-সুনান, (কিতাবুল সুন্নাত) হা নং ৪০৭৫।]

৩। বিদ'আত সুন্নাত নির্মূলকারী-

বিদ'আতের প্রচলনের ফলে সুন্নাতের উপর আমল কমে যায়। এক পর্যায়ে বিদ'আতগুলোই বড় পূন্যের কাজ বলে সমাজে শিকড় গেড়ে বসবে আর এক এক করে সুন্নাত গুলো ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল-াহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "লোকেদের কাছে এমন সময় আসবে, যখন তারা নতুন নতুন বিদ'আত সৃষ্টি করবে এবং এক এক করে সুন্নাত গুলো মেরে ফেলবে। অবশেষে বিদ'আতগুলো মাথাচড়া দিয়ে উঠবে এবং সুন্নাত সমুহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে"। হযরত আব্দুল-াহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে কোন বিদ'আত উদ্ভব হওয়ার পর পর দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পক্ষান্তরে যে কোন সুন্নাত তুলে নেওয়ার পর ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে যায়"। হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, " লোকেরা তাদের দ্বীনের মধ্যে যে মাত্র কোন বিদ'আত চালু করে, আল-াহ তাআলা তাদের নিকট থেকে অনুরূপ একটি সুন্নাত তুলে নিয়ে যান। পরে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর তাদের নিকট ফিরিয়ে আনেন না"। হযরত গুদায়ফ ইবনুল হারিস আস-ছুমালী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, "লোকেরা যে মাত্র কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করে, তখন তদনুরূপ একটা সুন্নাত সেখান থাকে তুলে নেওয়া হয়। অতএব বিদ'আত উদ্ভাবন করার চাইতে সুন্নাত আকড়ে ধরাই উত্তম"।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাসুলুল-াহ (সাঃ) ফরজ নামাজের পর একান্তে বসে নীরবে কিছু তাসবীহ, তিলাওয়াত ও যিকিরের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব তাসবীহ, তিলাওয়াত ও যিকরের পরিবর্তে আমাদের সমাজে সম্মিলিত ভাবে মুনাজাতের প্রচলন ঘটায় রাসুলুল-াহ (সাঃ) এর শেখানো সে তাসবীহ ও যিকর আদায় করার সুন্নাত ক্রমেই আমাদের থেকে উঠে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস আলফেসানীর 'মাকতুবাত' থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তিনি লিখেছেন, এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করলো, আপনারা বলেছেনঃ যে কোন বিদ'আতই নাকি একটি সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে। আচ্ছা যদি মৃত ব্যক্তিকে একটি কাফনের সাথে একটি পাগড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোন সুন্নাতটি বিলুপ্ত হয়? কি কারণে এটা বিদ'আত বলা হবে? আমি জবাবে লিখলামঃ অবশ্যই একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয় যদি মৃতের কাফনে পাগড়ি দেওয়া হয়। কারণ পুরুষের কাফনে সুন্নাত হলো কাপড়ের সংখ্যা হবে তিন। পাগড়ী পরলে এ সংখ্যা আর তিন থাকে না, সংখ্যা দাঁড়ায় চার।

উদাহরণ হিসাবে আরো বলা যায়, এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ল। ঋন পরিশোধ করতে পারছেনা। এ সমস্যার জন্য এক পীর সাহেবের কাছে গেল।পীর সাহেব তাকে বললেন, তুমি এক খতম কুরআন বখশে দাও অথবা নির্দেশ দিলেন একটা মীলাদ দাও বা খতমে ইউনুসের ব্যবস্থা কর। সে তাই করল। ফলাফল কি দাড়াল? ঋন পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি দু'আ রয়েছে যা আমল করা সুন্নাত। বিদ'আত অনুযায়ী আমল করার কারণে সে সেই সুন্নাতটি পরিত্যাগ করল। জানার চেষ্টা করলনা যে, এক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) কি ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। অন্য দিকে সে মীলাদ, কুরআন খতম ইত্যাদি বিদ'আতী কাজ করে আরো আর্থিক ঋনভারে জর্জরিত হলো।

রমজানের শেষ দশ দিনের রাতসমূহে রাত জেগে ইবাদাত বন্দেগী করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু ১৫ শাবানে রাত জাগাকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় সেভাবে এ সুন্নাতী আমলের প্রচলন দেখা যায় না। বরং শবে কদরের মূল্যায়ন শবে বরাতকে করা হচ্ছে।

আপনি দেখবেন এভাবে প্রতিটি বিদ'আত একটি সুন্নাতকে অপসারিত করে উহার স্থান দখল করে নিয়েছে।

৪। উম্মাতের মধ্যে বিভক্তি ও বিভাজন সৃষ্টির একটি বড় উপলক্ষ-

বিদ'আতের প্রচলনের ফলে উম্মতের মধ্যে বিভক্তি ও বিভাজন দেখা দেয় এবং তা ক্রমশ প্রকট রূপ লাভ করে থাকে। বিদ'আতীরা স্বভাবতই তাদের নতুন পথ ও মতের দিকে লোকেদের আহবান জানায় এবং তাদের দল ভারী করতে চায়। আর এ কারণে হকপন্থীদের সাথে তাদের ভীষণ মতবিরোধ ও ক্লেশ সৃষ্টি হয়। কখনো তা হানাহানির পর্যায়ে পৌছে। যদি তারা হেরে যায় তবে তারা ক্ষমতাবানদের আশ্রয় নেয় এবং তাদের সহযোগীতায় হকপন্থীদের উপর চড়াও হয় এবং তাঁদেরকে নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করতে থাকে। এভাবেই উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দল ও মতের। এর ফলেই নানা দল ও ফিরকায় বিভক্ত উম্মাত আজ এক মহা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আল-াহ তাআলা বলেন, "নিশ্চই যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই"। আয়াতে উলে-খিত 'ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার' অর্থ হলোঃ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান ধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেওয়া। এ উম্মাতের বিদ'আত প্রবণ লোকেরাই নিজেদের ইচ্ছামত নতুন নতুন বিষয়কে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। হযরত উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে বলেছিলেন, "এ আয়াতে এ উম্মাতের প্রবৃত্তির অনুসারী, বিদ'আত ও পথভ্রান্ত লোকেদের বোঝানো হয়েছে"। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। এ কারণেই রাসূল (সাঃ) দ্বীনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ উদ্ভাবন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

৫। বিদ'আত রাসূল (সাঃ) এর বিরূদ্ধে খিয়ানাতের এক ধরণের অভিযোগ-

যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতের প্রচলন করল বা আমল করল আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন "এ কথা বা কাজটি যে ইসলাম ধর্মে পছন্দের বিষয় এটা কি রাসূল (সাঃ) জানতেন? তিনি উত্তরে হ্যা অথবা না বলবেন। যদি না বলেন তাহলে তিনি স্বীকার করে

নিলেন যে, ইসলাম সম্পর্কে আল-াহর রাসূল (সাঃ) কম জানতেন। আর যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, আল-াহর রাসূল (সাঃ) বিষয়টি জানতেন, কিন্তু উম্মতের মধ্যে প্রচার করেন নি। এ অবস্থায় তিনি কি তাবলীগে শিথিলতা করেছেন? (নাউ'যুবিল-াহ)!

৬। বিদ'আত আমলকারীর তাওবা করার সুযোগ হয়না-

বিদ'আত যিনি প্রচলন করেন বা সে অনুযায়ী আমল করেন, তিনি এটাকে এক মহৎ কাজ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন আল-াহ তা'আলা এ কাজে সন্তুষ্ট হবেন। যেমন আল-াহ তা'আলা খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন তারা ধর্মে বৈরাগ্যবাদের বিদ'আত চালু করেছিল আল-াহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য। যেহেতু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদ'আতকে পাপের কাজ মনে করেন না, তাই তিনি এ কাজ থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করেন না এবং তাওবা করার সুযোগও হয়না। অন্যান্য পাপের বেলায় কমপক্ষে যিনি পাপে লিপ্ত হন তিনি এটাকে অন্যায় মনে করেই করেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুশোচনা আসে, এক সময় তাওবা করে আল-াহ তা'লার ক্ষমা লাভ করেন। কিন্তু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির এ অবস্থা কখনো হয়না।

৬। বিদ'আত মুসলিম সমাজে কুরআন ও হাদিসের গুর"ত্ব কমিয়ে দেয়-

কুরআন ও সুন্নাহ হল মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের রক্ষাকবচ। ইসলাম ধর্মের অস্ড়িত্বের একমাত্র উপাদান। তাইতো বিদায় হজ্জেও নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ তোমরা তা আকড়ে রাখবে ততক্ষণ তোমরা বিভ্রান্ড় হবে না।

বিদ'আত অনুযায়ী আমল করলে কুরআন ও সুন্নাহর মর্যাদা মানুষের অন্ড়র থেকে কমে যায়। যে কোন 'নেক আমল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে'-এ অনুভূতি মানুষের অন্ড়র থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। তারা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, পীর-মাশায়েখ ও ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

মিলাদ

মিলাদের আবিষ্কার

ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাউদ্দীন আইয়ুবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কতৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভণ্র আবু সাঈদ মুযাফফর"দ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিজরী ও কারো হিসাব মতে ৬২৫ হিঃ তে মীলাদের প্রচলন ঘটান বলে কথিত আছে। প্রতি বছর মীলাদুন্নবীর মওসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী ২০ টি খানকাহে তিনি গান-বাদ্যর আসর বসাতেন। কখনো মুহাররম কখনো সফর মাস থেকে এই মওসুম শুর" হতো। মিলাদুন্নবীর দুই দিন আগে থেকেই খানক্বাহের আশে পাশে গর"-ছাগল জবাই-এর ধুম পড়ে যেত। কবি, গায়ক, ওয়ায়েয সহ অসংখ্য লোক সেখানে ভিড় জমিয়ে মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হত। ইবনুল জাওযী বলেন, গভণ্র নিজে নাচে অংশ নিতেন। মইযযুদ্দীন হাসান বলেন, তিনি আলেমদেরকে উপঢৌকন ও চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীস ও বানোয়াট গল্প লিখতে বাধ্য

করতেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, মুযাফফরউদ্দীনের মীলাদ মাহফিলগুলোতে নামধারী সুফীরা উপস্থিত হোন এবং এ মাহফিল ফজর থেকে যোহর পর্যন্ড় চলত। তিনি এই মীলাদের জন্য তিন লক্ষেরও বেশী স্বর্ণমুদ্রা খরচ করতেন। [মাকরিজীর আল খুতাত ১ম খন্ড ৪৯০পৃঃ, মির-আতুয জামা-ন ফী তা-রীখীল আ'ইয়ান ৮ম খন্ড ৩১০ পৃঃ, পূর্বোক্ত তানবিহু উলিল আবসা-র ৩২ পৃঃ]

অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মীলাদ পাঠের নিয়ম ৫৯০ হিজরী সনে বরকুক সুলতান ফরাহ ইবনু নসরের যুগে প্রচলিত হয়। তিনি খুব আরাম প্রিয় সুলতান ছিলেন। শরী'আতের কড়াকড়ি নির্দেশ তিনি মেনে চলতেন না। সামান্য কাজে কিভাবে বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় এরূপ কাজের অনুসন্ধান করতেন। অবশেষে শাফীঈ মাযহাবের এক বিদ'আতী পীর প্রচলিত মীলাদ পাঠের পদ্ধতি আবিষ্কার করে সুলতানকে উপহার দেন। সুলতান বড় সাওয়াবের কাজ মনে করে তাঁর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্ম পালনের নামে মীলাদ পাঠের ব্যবস্থা চালু করেন। সেখান থেকেই প্রচলিত মীলাদের উদ্ভব ঘটে।

এই মীলাদের পুর্ণ বিবরণ পরবর্তীকালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক খালি- কান (৬৮১হিজরী) তার গ্রন্থে উলে- খ করেছেন। তারপর জালালুদ্দীন আস-সূয়ুতী (মৃত্যু ৯১১হিজরী) তাঁর হুসনূল মুহাযরা ফী আমালীল মাওয়ালীদ গ্রন্থে ইবনু খালি- কানের লেখার উপর নিভুর করে মীলাদের বিবরণ পেশ করেন। সুলতান মুজাফফরউদ্দীন যে মীলাদ চালু করেছিল তাতে যথেষ্ট খৃস্টীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কারণ সে সময় ক্রুসেড যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সিরিয়া, জের ুজালেম প্রভৃতি এলাকায় গমণ করেছিল। তারা যীশু খৃষ্টের জন্মদিন পালন করত। এসব দেখে শুনে সুলতান মুজাফফর উদ্দিনের মনে রাসূল (সাঃ) এর জন্ম দিবস তথা মীলাদের অনুষ্টান করার প্রেরণা জাগে। সুফীদের সাথে যোগাযোগ রেখে তিনি ৪টি খানকাহ নির্মাণ করেন। রাসূল (সাঃ) এর ইন্ড়কালের প্রায় ৪০০ বছর পর খৃষ্টানদের মধ্যস্থতায় প- াটিনাসের নূরের মতবাদ ইসলামের হিকামাতুল ইশরাব বা ফালসাফাতুল ইসলাহ নামে ইসলামী লেবাসে প্রথমে সুফীদের মধ্যে ও পরে মীলাদের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করে।

এছাড়াও মীলাদের ইতিহাস সম্পর্কে প্রখ্যাত হানাফী আলিম ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা মরহুম মাওলানা আঃ রহিম তাঁর সুন্নাত ও বিদ'আত বইয়ের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মীলাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলোঃ রাসূল (সাঃ) এর ২০০ বছর পর এমন এক বাদশাহ প্রচলন করেন যাকে ইতিহাসে ফাসিক ব্যক্তি বলে উলে- খ করা হয়েছে। জামে আজহারের শিক্ষক ডাঃ আহমাদ শারবাকী লিখেছেনঃ ৪০০ হিজরীতে ফাতিমী শাসকরা মিশরে এর প্রচলন করেন। একথাও বলা হয় যে, শাইখ ইবনু মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি ইরাকের মুসিল শহরে এর প্রচলণ করেন। পরে গভর্নর আবু সাঈদ মুযাফফর উদ্দীন ইরাকের এরবল শহরে মীলাদ চালু করেন। এই মীলাদুন্নবী ও মীলাদের ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে, এগুলো কুরআন ও হাদীস সমর্থিত নয় বরং ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নীপুজকদের রীতি অনুকরণ ও অনুসরণ। আর অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ সম্পর্কে বিশ্ব নবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাঁর দলভুক্ত হয়ে থাকে। (আবু দাউদ ২য় খন্ড ২৩০পৃঃ, মুসনাদে আহমাদ ২য় খন্ড ৫০ ও ৯২ পৃঃ, মিশকাত ৩৭৫ পৃঃ, তাহা-বীর মুশকিলুল আসা-র ১ম খন্ড ৮৮ পৃঃ, নাসবুর রা-য়াহ ৪র্থ খন্ড ৩৪৮ পৃঃ)।

আলেমদের সহযোগিতা

আবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এগিয়ে আসেন তিনি হলেন আবুল খাত্ত্বাব ওমার বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি 'আততানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লেখেন এবং সেখানে বহু জাল এবং বানাওয়াট হাদীস জমা করেন। অতঃপর বইটি ৬২৬ হিজরীতে গভণ্র কুকুবুরীর নিকট পেশ করলে তিনি খুশি হয়ে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা বখশিশ দেন। (দেখুনঃ তারীখ ইবনে খালি- কান)।

ক্রমে ক্রমে অন্যান্য আলেমগণও ওই একই পথ ধরলেন। কেউ বা সরকারের ভয়ে চুপ থাকলেন অথবা বদ দো'আ করেই ক্ষান্ড় হলেন। কিন্তু বিদ'আত চালু হয়েই গেল, যা আজও চলছে।

মীলাদ বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমতঃ

'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' কিতাবে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্টান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তারা বলেন, এরবলের গভণ্র কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তাঁর আমলে আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীস তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বীয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন। (মীলাদুন্নবী পৃঃ ৩৫)

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামঃ

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়েখ আহম্মদ সারহিন্দী, আল-ামা হায়াত সিন্দী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমূখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও অনেক হাদীস বিদ্বানগণ সকলে একবাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্টানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন। [মীলাদুন্নবী পৃঃ ৩২-৩৩; মীলাদে মুহাম্মদী পৃঃ ১৬-২০, ৩০-৩২; গাংগোহী ও সাহারানপুরী, 'ফাতওয়া মীলাদ শরীফ' সংকলনেঃ মুহাম্মদ আতাহার উছমানী (দেউবন্দ, ভারতঃ মুহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, তাবি), পৃঃ ৩-৪]

কিয়ামের নামে যা করা হচ্ছেঃ

কিয়াম আরবী শব্দ যার অর্থ দাঁড়ানো। মীলাদের এক পর্যায়ে সকলেই দাঁড়িয়ে যায় এবং দর"দের নামে বিদ'আতি শব্দগুলো বলতে থাকেন যথা-ইয়া নাবী সালামু আলাইকা ইত্যাদি। সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল-ামা তাক্বীউদ্দিন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) কতৃক কিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে। [আবু সাঈদ মুহাম্মদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬) পৃঃ১৭)] কিন্তু একবারও কি চিন্ড়া করে দেখা হয় যে, কি বলা হচ্ছে। যেমন আরবীতে ইয়া শব্দ দ্বারা কারো উপস্থিত বা বর্তমানকালে হাজির বুঝায়। যারা কিয়াম করে তাদের যুক্তি হলো, তারা রাসূল (সাঃ) এর সম্মানে তাঁর রূহের সম্মানে দাঁড়ান। কিন্তু প্রশ্ন হলো- যদি রাসূল (সাঃ) স্বয়ং বা তাঁর রূহ হাজির হয় তাহলে বিভিন্ন জায়গায় একই সময় মীলাদ ও কিয়াম হয়ে থকে তখন রাসূলের (সাঃ) রূহ কিভাবে একই সময় হাজির হন আর রাসূল (সাঃ) বা কিভাবে জেনে থাকেন ওখানে মীলাদ হচ্ছে। অথচ কুরআনে আল-াহ পাক বলেছেন-"হে রাসূল! আপনি বলে দিন, যদি আমি গায়িব জানতাম তবে ভালকেই বাড়িয়ে নিতাম এবং কোন ক্ষতিই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না"। (সূরা আল-আরাফঃ ১৮৮)

আল-াহ তাআল আরো বলেন, "বলুন হে রাসূল! আল-াহ ছড়া কেহই গায়িব জানে না (সূরা আন-নামালঃ ৬৫)। পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল (সাঃ) জীবিত অবস্থায়ই গায়িব জানতেন না। তবে হ্যাঁ তিনি (সাঃ) ততটুকু গায়িবই জানতেন যতটুকু আল-াহ তাকে জানিয়েছেন, এর বেশী নয়। অথচ মৃত্যুর পর কোথায় মীলাদ হচ্ছে তিনি কিভাবে জানবেন বরং এগুলো হলো ভ্রান্ড় ধারণা ও শিরকী আক্বীদাহ।

প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল-াহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আল-াহর রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ মহান আল-াহ বিশ্ব নবীর মান মর্যাদা রক্ষার জন্য হাজার হাজার লাখ লাখ দল মালাইকা-কে (ফেরেশতা-কে) নিযুক্ত করে রেখেছেন, তারা সদা সর্বদা দ্র ত গতিতে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে থাকেন। আর বিশ্বের মাঝে যেখানে যেখানে যে কোন ব্যক্তি বিশ্বনবীর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন সাথে সাথে সে ভ্রমণকরী মালাইকাগণ আমার নিকট তাঁর দরূদ ও সালাম পৌছিয়ে দেন।

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সালাম ও দরূদ পৌছানোর জন্য লাখ লাখ দল মালাইকা মওজুদ আছেন। বিশ্বনবী (সাঃ) সালাম ও দরূদের জন্য দ্বারে দ্বারে মীলাদখানির মাহফিলে ঘুরাঘুরি করেন না।

দ্বিতীয় হাদীস আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণীত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে দরূদ ও সালাম পাঠ করে তা আমি শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি বহুদূর দুরান্ড় থেকে দর দ ও সালাম পাঠ করে, তা মালাইকাগনের (ফেরেশ্তাগণের) মাধ্যমে আমার নিকট পৌছিয়ে দেওয়া হয়"।

হানাফী 'ফিকহে আকবারে' পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল-াহর নবী (সাঃ) গায়েব জানতেন, সে ব্যক্তি কাফের'। অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে, যারা ধারণা করে যে, মিলাদের মজলিসগুলোতে রাসুলুল-াহ (সাঃ) এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক'। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতওয়াহ বাযযারিয়া'তে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাজির হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি কাফের'। রাসুলুল-াহ (সাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাড়ানোর বিরূদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত, তাহক্বীক আলবানী (বৈর তে ছাপা, ১৯৮৫) 'আদাব' অধ্যায়, হা/৪৬৯৯। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর তারই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাড়ানোর যুক্তি ধোপে টেকে কি?

প্রিয় পাঠক! এখন আপনিই চিন্ড়া কর ন, যদি আল-াহর নবী (সাঃ) দেশে দেশে, মীলাদের মাহফিলে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে থাকেন, তাহলে উক্ত হাদীসের অর্থ কি করবেন? দর দ পৌছাবার জন্য যখন আল-াহর পক্ষ হতে দলে দলে মালাইকা (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছেন তখন আল-াহর নবীর মীলাদ মাহফিলে হাজির হওয়ার প্রয়োজন কি? এক আল-াহর নবী যদি মীলাদের মাহফিলে হাজিরই হবেন তবে আল-াহর তরফ হতে লাখ লাখ মালাইকা নিযুক্ত হওয়ারই বা প্রয়োজন কি? এতে প্রমাণ হলো যে, আল-াহর নবী কোন দিনই মীলাদ মাহফিলে হাজির হন না। আর এটাও জানা দরকার যে, মীলাদ ও দরূদ এক জিনিস নয়।

অনেকে বলেন যে, এটাতো একটা ভাল কাজ, ইবাদাত বন্দেগী। কিন্তু বিদ'আত তো কোন খারাপ কাজ করা নয়, বরং বিদ'আত তো ধর্ম কর্মই। তবে নতুন তরীকায় যা আমাদের নবীজী শিখিয়ে যাননি এবং তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।

একটি উদাহরণ দিইঃ হাদীসটি সহীহ এবং দ্বারেমী, আস-সুনান (আল মুকাদ্দামাহ) হা নং ২১০ থেকে নেওয়া- হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, "আমি একসময় মসজিদে লোকদেরকে বিভিন্ন হালকায় বিভক্ত হয়ে নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখলাম, প্রত্যেক হালকার মধ্যে একজন লোক আছে এবং লোকদের সামনে কংকর আছে, ব্যক্তিটি বলে, তোমরা একশ বার আল-াহু আকবার পড় আবার বলছে, একশ বার লা ইলাহা ইল-াল-াহু বলো আবার বলছে একশবার সুবাহানাল-াহ পড়। লোকেরা তাঁর নির্দেশমত একেকবার এক একটি পড়তে লাগলো। এ কথা শুনে আব্দুল-াহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) কে বললেন, "তুমি তাদেরকে কেন তাদের পাপগুলো গণণা করতে নির্দেশ দাওনি ও কেন তাদেরকে নিশ্চয়তা দাওনি যে তাদের কোন নেক আমলই নষ্ট হবে না"। এরপর তিনি সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে মসজিদে গেলেন এবং বললেন, " আমি তোমাদেরকে এসব কি করতে দেখতে পাচ্ছি? তারা বলল আবু আব্দির রহমান এইতো কিছু কংকর, এগুলার সাহায্যে আমরা তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ গণনা করছি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন তাহলে তোমরা তোমাদের পাপরাজিও গণনা করো। হে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মাত তোমাদের জন্য অত্যান্ড় দুঃখ তোমরা কতই না দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছ। অথচ আমাদের নাবীর সাহাবীরা এখনো জীবীত আছেন, তাঁর পরিধেয় কাপড় এখনো পুরনো হয়নি! হয়তো তোমরা মিল-াতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাইতে উত্তম কোন নির্দেশিকা পেয়েছো অথবা এর মাধ্যমে তোমরা গোমরাহীর দ্বার খুলতে যাচ্ছো। তখন তারা বলল, আবু আবদির রহমান! আল-াহর কসম আমরা তো কেবল ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই করছি। তখন তিনি বললেন, 'এমন অনেক লোকও আছেন যারা ভাল কাজই করতে চায়, কিন্তু তারা ভালো কাজের নাগাল পায়না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিছু লোক কুরআন পড়বে অথচ এ কুরআন তাদের গলাদেশ অতিক্রম করবে না। আল-াহর কসম! আমি জানিনা, হয়ত এ জাতীয় অধিকাংশ লোকই তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে।

সুতরাং রাসূল (সাঃ) নির্দেশিত তরীকার বাইরে ইবাদাত করে নিজের ক্ষতি ডেকে আনা ছাড়া আর কোন সাওয়াবই হাসিল হবেনা। [সূত্রঃ "মীলাদ"– আ.আ. গালীব, "মীলাদ, শবে বরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত"- হাফেজ মো: আইয়ুব বিন ইদু মিয়া]

শবে বরাত

এই অংশটুকু সম্পূর্ণরূপে "শবে বরাতঃ সঠিক দৃষ্টিকোণ"-সংকলক আব্দুল-াহ শহীদ আব্দুর রহমান। সম্পাদনাঃ যাকারিয়া খাজা আহম্মদ, ইকবাল হোছাইন মাসুম, আবুল কালাম আযাদ, নুমান আবুল বশর, জাকের্ল-াহ আবুল খায়ের থেকে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে হজ্ব ও ওমরাহর সময় সৌদী সরকার কর্তৃক বিতরণকৃত পুস্ড়িকা-"তাওহীদ সংরক্ষণ"; আব্দুল-াহ বিন আব্দুর রহমান আল জিবরীন; মুহাম্মদ আসাদুল-াহ আল-গালীবের "শবে বরাত"; শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম এর "শবে বরাতের সমাধান" এবং সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলো (যা প্রথমে উলি-খিত হয়েছে) দিয়ে রেফারেন্স গুলো তাহক্বীক করা

হয়েছে এবং তাফসীর ইবন কাসীর, মারেফুল কুরআন সহ অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে দেখা গেছে রেফারেন্সগুলো ও ব্যাখ্যাগুলো সহীহ।

আল কুরআনে শবে বরাতের কোন উলে- খ নেই

শবে বরাত বলুন বা লাইলাতুল বরাত বলুন কোন আকৃতিতে শব্দটি কুরআন মাজীদে খুজে পাবেন না। সত্য কথাটাকে সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় পবিত্র কুরআন মাজীদে শবে বরাতের কোন আলোচনা নেই।

অনেককে দেখা যায় শবে বরাতের গুর"ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সূরা দুখানের প্রথম চারটি আয়াত পাঠ করেন। আয়াতসমূহ হলঃ "হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমিতো এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে। আমিতো সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। (সূরা দুখান, ১-৪)

শবে বরাত পন্থী আলেম উলামারা এখানে বরকতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, যারা এখানে বরকতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন তারা এত বড় ভুল করেন, যা আল-াহর কালাম বিকৃত করার মত অপরাধ।

কারণঃ

(এক) কুরআন মাজীদের এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সূরা আল-কদর দ্বারা করা হয়। সেই সূরায় আল-াহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ "আমি এই কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। আপনি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য মালাইকা (ফেরেশতাগণ) ও রূহ অবতীর্ণ হন তাদের পালনকর্তার নির্দেশে। এই শান্ড়ি ও নিরাপত্তা ফজর পর্যন্ড় অব্যাহত থাকে"।

অতএব বরকতময় রাত হল লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল বারায়াত নয়। সূরা দুখানের প্রথম সাত আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই সূরা আল কদর। আর এ ধরণের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হল সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

(দুই) সূরা দুখানের লাইলাতুল মুবারাক অর্থ যদি শবে বরাত হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় আল কুরআন শাবান মাসের শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা সকলে জানি আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রামাজান মাসের লাইলাতুল কদরে।

যেমন সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল-াহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ "রামাজান মাসে, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন।

(তিন) অধিকাংশ মুফাচ্ছিরে কিরামের মত হল উক্ত আয়াতে বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। শুধুমাত্র তাবেয়ী ইকরামা রহঃ এর একটা মত উলে- খ করে বলা হয় যে, তিনি বলেছেন, বরকতময় রাত বলতে শাবাণ মাসের পনের তারিখের রাতকেও বুঝানো যেতে পারে।

তিনি যদি এটা বলে থাকেন তাহলে এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। যা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে পরিতাজ্য। এ বরকতময় রাতের দ্বারা উদ্দেশ্য যদি শবে বরাত হয় তাহলে শবে কদর অর্থ নেওয়া চলবেনা।

(চার) উক্ত আয়াতে বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা শবে বরাত করা হল তাফসীর বির-রায় (মনগড়া ব্যাখ্যা), আর বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা লাইলাতুল কদর দ্বারা করা হল কুরআন ও হাদীসের তাফসীর। সকলেই জানেন কুরআন ও হাদীস সম্মত ব্যাখ্যার উপস্থিতিতে মনগড়া ব্যাখ্যা গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই।

(পাঁচ) সূরা দুখানের ৪ নং আয়াত ও সূরা কদরের ৪ নং আয়াত মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ মুফাসসিরে কিরাম এ কথাই জোর দিয়ে বলেছেন এবং সূরা দুখানের 'লাইলাতুম মুবারাকা'র অর্থ শবে বরাত নেওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তাফসীরে মারেফুল কুরআন দ্রষ্টব্য)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেনঃ "কোন কোন আলেমের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত)। কিন্তু এটা একটা বাতিল ধারণা।

অতএব এ আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকা'র অর্থ লাইলাতুল কদর। শাবান মাসের পনের তারিখের রাত নয়।

(ছয়) ইকরামা (রাঃ) বরকতময় রজনীর যে ব্যাখ্যা শাবানের ১৫ তারিখ দ্বারা করেছেন তা ভুল হওয়া স্বত্তেও প্রচার করতে হবে এমন কোন নিয়ম কানুন নেই। বরং তা প্রত্যাখ্যান করাই হল হকের দাবী। তিনি যেমন ভুলের উর্ধ্বে নন, তেমনি যারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তারা ভুল শুনে থাকতে পারেন অথবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বানোয়াট বর্ণনা দেওয়াও অসম্ভব নয়।

(সাত) শবে বরাতের উক্ত বর্ণনায় সূরা দুখানের উক্ত আয়াত উলে- খ করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই আকীদাহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, শবে বরাতে সৃষ্টিকূলের হায়াত-মাউত, রিযক-দৌলত সম্পর্কে সিদ্ধান্ড় নেয়া হয় ও লিপিবদ্ধ করা হয়। আর শবে বরাত উদযাপনকারীদের শতকরা নিরানব্বই জনের বেশী এ ধারণাই পোষন করে থাকেন। তারা এর উপর ভিত্তি করে লাইলাতুল কদরের চেয়ে ১৫ শাবানের রাতকে বেশী গুর"ত্ব দেয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ বিষয়গুলি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। তাই যারা শবে বরাতের গুর"ত্ব বুঝাতে উক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন তারা মানুষকে সঠিক ইসলামী আকীদাহ থেকে দূরে সরানোর কাজে লিপ্ত, যদিও মনে-প্রাণে তারা তা ইচ্ছা করেন না।

(আট) ইমাম আবু বকর আল জাসসাস তাঁর আল-জামে লি আহকামিল লুরয়াআন তাফসীর গ্রন্থে লাইলাতুন মুবারাকা দ্বারা মধ্য শাবানের রাত উদ্দেশ্য করা ঠিক নয় বলে বিস্ড়রিত আলোচনা করার পর বলেনঃ লাইলাতুল কদরের চারটি নাম রয়েছে, তা হলঃ লাইলাতুল কদর, লাইলাতু মুবারাকাহ, লাইলাতুল বারাআত, লাইলাতুস সিক। (আল জামে লি আহকামিল কুরআন, সূরা আদ-দুখানের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

লাইলাতুল বারাআত হল লাইলাতুল কদরের একটি নাম। শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতের নাম নয়। ইমাম শাওকানী (রহঃ) তাঁর তাফসীর ফাতহুল কাদীরে একই কথাই লিখেছেন। (তাফসীর ফাতহুল কাদীরঃ ইমাম শাওকানী দ্রষ্টব্য)

এ সকল জেনে বুঝেও যারা 'লাইলাতুম মুবারাকা'র অর্থ করবেন শবে বরাত, তারা সাধারণ মানুষদের গোমরাহ করা এবং আল-াহর কালামের অপব্যাখ্যা করার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না।

শবে বরাত নামটি হাদীসের কোথাও উলে- খ হয়নি

প্রশ্ন থেকে যায় হাদীসে কি লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত নেই? সত্যিই হাদীসের কোথাও আপনি শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত নামে কোন রাতের নাম খুজে পাবেন না। সকল হাদীসে এ রাতের কথা বলা হয়েছে তাঁর ভাষা হল 'লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান' অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত্রি। শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত শব্দ আল-কুরআনে নেই, হাদীসে রাসূলেও নেই। এটা মানুষের বানানো একটা শব্দ। ভাবলে অবাক লাগে যে, একটি প্রথা ইসলামের নামে শত শত বছর ধরে পালন করা হচ্ছে অথচ এর আলোচনা আল-কুরআনে নেই। সহীহ হাদীসেও নেই। অথচ আপনি দেখতে পাবেন যে, সামান্য নফল আমলের ব্যাপারেও হাদীসের কিতাবে এক একটি অধ্যায় বা শিরোনাম লেখা হয়েছে। এমন কি মধ্য সাবানের রাত এর কথা বুখারি, মুসলিম শরিফ এর একটি হাদীসও নেই, যেখানে আপনি বলছেন এই রাত এ এক বছরের ভাগ্য লেখা হয়, সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, একবছরের বাজেট প্রনিত হয়, এরকম এক রাত এর কথা সবচেয়ে নিভ্রযোগ্য হাদীস বই দুই টির লেখক এক ফোঁটাও জানতে পারলেন না।এমনকি সুনান আবু দাউদ এও এর ব্যপারে টু শব্দটিও নেই, সুনান তিরমিযি তে একটি হাদীস ফজিলত নিয়ে বর্ণিত হলেও তিনি নিজেই ওই হাদীস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, অদ্ভুত মনে হয় না আপনার কাছে?

ফিকহের কিতাবে শবে বরাত

শুধু আল-কুরআনে বা সহীহ হাদীসে নেই, বরং আপনি ফিকহের নিভ্রযোগ্য কিতাবগুলো পড়ে দেখুন, কোথাও শবে বরাত নামে কোন কিছু পাবেন না। বাংলাদেশ সহ ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীনি মাদ্রাসাগুলিতে ফিকহের যে সিলেবাস রয়েছে যেমন মালাবুদ্দা মিনহু, নুর-ল ইজাজ, কুদুরী, কানযুদ দাকায়েক, শরহে বিকায়া ও হিদায়াহ খুলে দেখুন না! কোথাও শবে বরাত নামে কোন কিছু পাওয়া যায় কিনা! অথচ আমাদের পূর্বসূরী ফিকাহবিদগণ ইসলামের অতি সামান্য বিষয়গুলি আলোচনা করতেও কোন ধরণের কার্পণ্যতা দেখাননি। তারা সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের সালাত সম্পর্কেও অধ্যায় রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদ তৈরি করেছেন কবর যিয়ারতের মত বিষয়েরও। শবে বরাতের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সামান্যতম ইশারা থাকলেও ফিকাহবিদগণ এর আলোচনা মাসাআলা-মাসায়েল অবশ্যই বর্ণনা করতেন। অতএব এ রাতকে শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত অভিহিত করা মানুষের মনগড়া বানানো একটি বিদ'আত যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়।

শবে বরাত সম্পর্কিত প্রচলিত আকীদাহ বিশ্বাস ও আমলঃ

শবে বরাত যারা পালন করেন তারা শবে বরাত সম্পর্কে যে সকল ধারণা পোষন করেন ও উপলক্ষ করে যে সকল কাজ করে থাকেন তা কিছু নিম্নে উলে- খ করা হল।

তারা বিশ্বাস করে যে, আল-াহ তা'আলা সকল গ্রস্ড়াণির এক বছরের খাওয়া দাওয়া বরাদ্দ করে থাকেন। এই বছর যারা মারা যাবে ও জন্ম নিবে তাদের তালিকা তৈরি করা হয়। এ রাতে বান্দার পাপ ক্ষমা করা হয়। এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করলে সৌভাগ্য

অর্জিত হয়। এ রাতে কুরআন মজীদ লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নযিল করা হয়েছে। এ রাতে গোসল করাকে সওয়াবের কাজ মনে করা হয়। মৃত ব্যক্তিদের রূহ এ রাতে তাদের সাবেক গৃহে আসে। এ রাতে হালুয়া-রুটি তৈরি করে নিজেরা খায় ও অন্যদের দেওয়া হয়। বাড়ীতে বাড়ীতে মীলাদ পড়া হয়। আতশবাজী করা হয়। সরকারী-বেসরকারী ভবনে আলোকসজ্জা করা হয়। সরকারী ছুটি পালিত হয়। পরেরদিন রোযা পালন করা হয়। কবরস্থানগুলো আগরবাতি ও মোমবাতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। লোকজন দলে দলে কবরস্থানে যায়। মাগরিবের পর থেকে মসজিদগুলো লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ও জুমু'য়ায় মসজিদে আসেনা তারাও এ রাতে মসজিদে আসে। মসজিদগুলোতে মাইক চালু করে ওয়াজ নসীহত করা হয়। শেষ রাতে সমবেত হয়ে দু'আ-মুনাজাত করা হয়। বহু লোক এ রাতে ঘুমানোকে অন্যায় মনে করে থাকে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বারো রাকাত, একশত রাকাত, ইত্যাদি সালাত আদায় করা হয়।

লোকজন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে 'হুজুর! শবে বরাতের সালাতের নিয়ম ও নিয়্যতটা একটু বলে দিন। ইমাম সাহেব আরবী ও বাংলা নিয়্যত বলে দেন। কিভাবে সালাত আদায় করবে, কোন রাকা'আতে কোন সূরা তিলাওয়াত করবে তাও বলে দিতে কৃপণতা করেন না। যদি এ রাতে ইমাম সাহেব বা মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তাদের চাকরী যাওয়ার উপক্রম হয়।

শবে বরাতের সম্পর্ক শুধু আমলের সাথে নয়

শবে বরাত সম্পর্কে উপরোলি-খিত কাজ ও আকীদাহসমূহ শবে বরাত উদযাপনকারীরা সকলেই করেন তা কিন্তু নয়। কেহ আছেন উলি-খিত সকল কাজের সাথে একমত পোষণ করেনা। আবার কেহ আতশবাজী, আলোকসজ্জা পছন্দ করেন না, কিন্তু কবরস্থানে যাওয়া, হালুয়া-রুটি, ইবাদাত-বন্দেগী করে থাকেন। আবার অনেক আছেন যারা এ রাতে শুধু সালাত আদায় করেন ও পরের দিন সিয়াম (রোযা) পালন করেন। এ ছাড়া অন্য কোন আমল করেন না। আবার অঞ্চলভেদে আমলের পার্থক্য দেখা যায়।

কিন্তু একটি বিষয় হল, শবে বরাত সম্পর্কে যে ধর্ম বিশ্বাস বা আকীদাহ পোষন করা হয় তা কিন্তু কোন দুর্বল হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় না। যেমন ভাগ্যলিপি ও বাজেট প্রণয়নের বিষয়টি। যারা বলেনঃ আমলের ফজীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায়, অতএব এর উপর ভিত্তি করে শবে বরাতে আমল করা যায়, তাদের কাছে প্রশ্নঃ তাহলে শবে বরাতের আকীদাহ সম্পর্কে কি দুর্বল হাদীসেরও দরকার নেই?

অথবা এ সকল প্রচলিত আকীদাহর ক্ষেত্রে যদি কোন দুর্বল হাদীস পাওয়াও যায় তাহলে তা দিয়ে কি আকীদাহগত কোন মাসআলা প্রমাণ করা হয়? আপনারা শবে বরাতের আমলের পক্ষ সমর্থন করলেন কিন্তু আকীদার ব্যাপারে কি জবাব দিবেন? কাজেই শবে বরাত শুধু আমলের বিষয় নয়, আকীদাহরও বিষয়।

শবে বরাত সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল-াহ তা'আলা এ রাতে আল-কুরান অবতীর্ণ করেছেন, তিনি এ রাতে মানুষের হায়াত, রিযিক ও ভাগ্যের ফায়সালা করে থাকেন, এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হলে আল-াহ হায়াত ও রিযিক বাড়িয়ে সৌভাগ্যশালী করেন ইত্যাদি আকীদা কি আল-াহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত অন্যায় নয়?

আল-াহ সুবহানাহু তা'আলা বলেনঃ

"তাঁর চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল-াহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?" (সূরা সাফ, ৭)

শাবানের মধ্যরজনীর ফজীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের পর্যালোচনাঃ

১ নং হাদীসঃ

ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) বলেন, আমাদের কাছে আহমাদ ইবনে মুনী, হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি যে তিনি ইয়াযীদ ইবনে হার"ন থেকে, হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসির থেকে, তিনি উরউয়াহ থেকে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি এক রাতে রাসূল (সাঃ) কে বিছানায় পেলাম না তাই আমি তাঁকে খুঁজতে বের হলাম, 'বাকী' নামক কবরস্থানে তাঁকে পেলাম। তিনি বললেনঃ তুমি কি আশংকা করেছ যে, আল-াহ ও তাঁর রাসূল তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন?

আমি বললামঃ হে আল-াহর রাসূল(সাঃ)!আমি মনে করেছি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আল-াহ রাব্বুল আলামীন শাবানের মধ্য রজনীর রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, অতঃপর কলব গোত্রের পালিত বকরীর পশমের পরিমানের চেয়েও অধিক পরিমাণ লোকদের ক্ষমা করেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ আয়িশা (রাঃ) এর এই হাদীস আমি হাজ্জাজের বর্ণিত সনদ (সুত্র) ছাড়া অন্য কোন ভাবে চিনি না। আমি মুহাম্মদকে (ইমাম বুখারী) বলতে শুনেছি যে, তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলতেন। তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ ইয়াহইয়াহ ইবনু কাসীর উরউয়াহ থেকে হাদীস শুনেন নি। এবং মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী) বলেছেনঃ হাজ্জাজ ইয়াহইয়াহ ইবনে কাসীর থেকে শুনেননি।

এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমীযির মন্ড়ব্যে প্রমাণ হয় যে, হাদীসটি দুইটি দিক থেকে মুনতাকি অর্থাৎ উহার সুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন। অপর দিকে এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ মুহাদ্দিসীনদের নিকট দূর্বল বলে পরিচিত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যারা শবে বরাতের বেশী বেশী ফাযীলত বর্ণনা করতে অভ্যস্ড় তারা তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসটি খুব গুর"ত্বের সাথে উপস্থাপন করেন অথচ যারা হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন তাদের এ মন্ড়ব্যটুকু গ্রহণ করতে চান না। এ হাদীসটি আমলের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য হওয়ার জন্য ইমাম তিরমিযীর এ মন্ড়ব্যটুকু কি যথেষ্ট নয়? যদি তর্কের খাতিরে এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ ধরে নেওয়া হয় তাহলে কি প্রমানিত হয়? আমরা যারা ঢাকঢোল পিটিয়ে মসজিদে একত্র হয়ে যেভাবে শবে বরাত উদযাপন করি তাদের আমলের সাথে এ হাদীসটির মিল কোথায়?

বরং এ হাদীসে দেখা গেল রাসূলুল-াহ (সাঃ) বিছানা ছেড়ে চলে গেলেন, আর পাশে শায়িত আয়েশা (রাঃ) কে ডাকলেন না। ডাকলেন না অন্য কাউকে। তাকে জাগালেননা বা সালাত আদায় করতে বললেন না। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, রামাযানের শেষ দশকে আল-াহর রাসূল (সাঃ) নিজে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন। বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতে বলতেন। যদি ১৫ শাবানের রাতে কোন ইবাদাত করার ফজীলত থাকত তাহলে আল-াহর রাসূল (সাঃ) কেন আয়েশা (রাঃ) কে বললেন না? কেন রমযানের শেষ দশকের মত সকলকে জাগিয়ে

দিলেননা, তিনি তো নেক কাজের প্রতি মানুষের আহবান করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তো কোন অলসতা বা কৃপণতা করেননি।

২ নং হাদীস

"আলা ইবনে হারীস থেকে বর্ণিত, আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ এক রাতে আল-াহর রাসূল (সাঃ) দাড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সিজদাহ এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ধারণা করলাম তিনি ইন্ড়কাল করেছেন। আমি এ অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল ধরে নাড়া দিলাম, আঙ্গুলটি নড়ে উঠল। আমি চলে এলাম। সালাত শেষ করে তিনি বললেনঃ হে আয়িশা অথবা বললেন হে হুমায়রা! তুমি কি মনে করেছ আল-াহর নবী তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছেন? আমি বললানঃ আল-াহর কসম হে রাসূল! আমি এমন ধারণা করিনি। বরং আমি ধারণা করেছি আপনি না জানি ইন্ড়কাল করেছেন। অতপর তিনি বললেনঃ তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললামঃ আল-াহর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটা মধ্য শাবানের রাত। এ রাতে আল-াহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ক্ষমা প্রার্থনা কারীদের ক্ষমা করেন এবং রহমত প্রার্থনাকারীদের রহম করেন। আর হিংসুকদের তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। (বাইহাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমান কিতাবে বর্ণনা করেছেন) হাদীসটি মুরসাল। সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়। কেননা বর্ণনাকারী 'আলা' আয়েশা (রাঃ) থেকে শুনেননি।

৩ নং হাদীস

আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিবসে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল-াহ তা'আলা সূর্যাস্ড়ের পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেনঃ আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করবো। আছে কি কোন রিযক প্রার্থনাকারী আমি রিযক দান করব। আছে কি কোন বিপদে নিপতিত ব্যক্তি আমি তাকে সুস্থ্যতা দান করব। এভাবে ফজর পর্যন্ড় বলা হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)

প্রথমতঃ এ হাদীসটি দূর্বল। কেননা এ হাদীসের সনদে (সূত্রে) ইবনে আবি সাবুরাহ নামে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি অধিকাংশ হাদীসবিশারদদের নিকট হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত। এ যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসির-দ্দিন আলবানী (রহঃ) বলেছন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে একেবারেই দূর্বল।

দ্বিতীয়তঃ অপর একটি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। সে সহীহ হাদীসটি হাদীসে নুযূল নামে পরিচিত, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলঃ "আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ আমাদের রব আল-াহ তা'আলা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন ও বলে থাকেনঃ কে আছ আমার কাছে দু'আ করবে আমি কবুল করব। কে আছ আমার কাছে চাইবে আমি দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি ক্ষমা করব। (বুখারী ও মুসলিম)

আর উলি-খিত ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল-াহ তা'আলা মধ্য শাবানের রাতে নিকটতম আকাশে আসেন ও বান্দাদের দু'আ কবুলের ঘোষনা দিতে থাকেন। কিন্তু বুখারী ও

মুসলিমে বর্ণিত এ সহীহ হাদীসের বক্তব্য হল আল-াহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষের দিকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করে দু'আ কবুলের ঘোষনা দিতে থাকেন। আর এ হাদীসটি সর্বমোট ৩০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী এবং মুসলিম ও সুনানের প্রায় সকল কিতাবে এসেছে। তাই হাদীসটি প্রসিদ্ধ। অতএব এই মশহুর হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে ৩ নং হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে।

কেহ বলতে পারেন যে, এই দু হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল-াহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন মধ্য শাবানের রাতের শুর" থেকে। আর এ হাদীসের বক্তব্য হল প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল-াহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতএব দু হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই যে কারণে ৩ নং হাদীসটি পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আসলেই এ দুটি হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। কেননা আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম হাদীসের বক্তব্য হল আল-াহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ অংশে দুনিয়ার আকাশে আসেন। আর প্রতি রাতের মধ্যে শাবানের রাতও অন্ড়র্ভুক্ত। অতএব এ হাদীস মতে অন্যান্য রাতের মত শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল-াহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে আসেন। কিন্তু ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের প্রথম প্রহর থেকে আল-াহ্ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

৪ নং হাদীসঃ

"উসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়ঃ আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কেহ কিছু চাহিবার আমি তাকে তা দিয়ে দিব। রাসুলুল-াহ (সাঃ) বলেছেনঃ মুশরিক ও ব্যভিচারী বাদে সকল প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করা হয়। (বায়হাকী, শুয়াবুল ইমান) বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসির"দ্দিন আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে তাঁর সংকলন 'যঈফ আল-জামে' নামক কিতাবের ৬৫২ নং ক্রমিকে দুর্বল প্রমাণ করেছেন। শবে বরাত সম্পর্কে এ ছাড়া বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীস সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেনঃ এ মর্মে বর্ণিত অন্য সকল হাদীসই দুর্বল।

শাবানের মধ্য রজনীর সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার সারকথা

শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসগুলো উলে-খ করা হল। আমি মনে করি এ সম্পর্কে যত হাদীস আছে সব এখানে এসেছে। বাকী যা আছে সেগুলোর অর্থ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। এ সকল হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবেই বুঝে নিতে পারি।

১। এ সকল হাদীসের কোন একটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে, ১৫ শাবানের রাতে আল-াহ তা'আলা আগামী এক বছরে যারা ইন্ড়কাল করবে, যারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কি খাবে সেই ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। যদি থাকেও তাহলে তা আল-কুরানের বক্তব্যের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আল-কুরানের স্পষ্ট কথা হল এ বিষয়গুলোর ফায়সালা হয় লাইলাতুল কদরে।

২। এ সকল হাদীসের কোথাও বলা হয়নি যে, এ রাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা তাদের গৃহে আসে। বরং এটি একটি প্রচলিত বানোয়াট কথা। মৃত ব্যক্তিদের আত্মা কোন কোন সময় গৃহে ফিরে আসার ধারণাটা হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাস।

৩। এ সকল হাদীসের কোথাও এ কথা নেই যে, আল-াহর রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম এ রাতে গোসল করেছেন, মসজিদে উপস্থিত হয়ে নফল নামাজ আদায় করেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, সারারাত জাগ্রত থেকেছেন, ওয়াজ নসীহত করেছেন কিংবা অন্যদের এ রাতে ইবাদাত বন্দেগী করতে বলেছেন অথবা শেষ রাতে জামাতের সাথে দু'আ মুনাজাত করেছেন।

৪। এ হাদীসসমূহের কোথাও এ কথা নেই যে, আল-াহর রাসূল (সাঃ) বা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ রাতের সাহরী খেয়ে পরের দিন সিয়াম(রোযা) পালন করেছেন।

৫। আলোচিত হাদীসসমূহে কোথাও এ কথা নেই যে, আল-াহর রাসূল (সাঃ) বা সাহাবায়ে কিরাম এ রাতে হালুয়া র"টি বা ভাল খানা তৈরী করে বিলিয়েছেন, বাড়িতে বাড়ীতে যেয়ে মীলাদ পড়েছেন।

৬। এ সকল হাদীসের কোথাও নেই যে, আল-াহর রাসূল (সাঃ) বা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ রাতে দলে দলে গিয়ে কবর যিয়ারত কিংবা কবরে মোমবাতি জ্বালিয়েছেন।

এমনকি আল-াহর রাসূল (সাঃ) এর যুগ বাদ দিলে খুলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের ইতিহাসেও কি এর কোন একটা আমল পাওয়া যাবে?

যদি না যায় তাহলে শবে বরাত সম্পর্কিত এ সকল আমল ও আকীদা কি বিদ'আত নয়? এ বিদ'আত সম্পর্কে উম্মাতে মুহাম্মদীকে সতর্ক করার দ্বায়িত্ব কারা পালন করবেন? এ দ্বায়িত্ব পালন করতে হবে আলেম-উলামাদের, দ্বীন প্রচারক, মসজিদের ইমাম ও খতিবদের। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ইশারা নেই সে সকল আমল থেকে সাধারণ মুসলিম সমাজকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরীদের। [এখানে আমার একটি দুঃখ বলি, আমার একজন প্রিয় খতিব এবার শবেবরাতের রাতে মসজিদে বলছেন, একে সাহিহ ভাবে সাব্যস্ড়, তা না বলে বলছেন, যত যাই হোক এই রাতে যে অনেক মানুষ নামাজ পড়তে আসছে এটাই বড় কথা, তা নির"ৎসাহিত করা অনুচিত। আপনি মানুষকে বিদাত এর ক্ষেত্রে উৎসাহিত করছেন, অথচ বলছেন না যে এরকম বিদাত করে আরো গুনাহ এর ভাগিদার না হয়ে বরং সবার উচিত প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, এক রাতে কেও সবকিছু হাসিল করতে পারবেনা আর আল-াহতায়ালা নিয়মিত আমলকে গ্রহণ করেন, আনুষ্ঠানিক আর বছরে একবার দুইবার ঘটা করে আমল করলে লাভ হবে না, আর নব উদ্ভাবিত ধর্ম কর্ম করে তো নয়ই। আর ফরজ নামাজ যে কোন মুল্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এর কোন বিকল্প নেই। রমজানেও তো মসজিদ ভরে যায় মুসলি- দিয়ে, তখন সবাইকে ধারাবাহিকতার জন্য ওয়াজ করেন। উৎসাহ দেন। বিদআতকে কেন উৎসাহিত করবেন?

ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কিত একটি হাদীস ও এর পর্যালোচনা

"শবে বরাত-সঠিক দৃষ্টিকোণ" বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর একজন বিশিষ্ট আলেম লেখক কে বলেছেনঃ শবে বরাতে সৌভাগ্য বা এক বছরের তাকদীর লেখা

সম্পর্কিত কোন হাদীস নেই বলে আপনি যে দাবী করেছেন তা সঠিক নয়। 'মিশকাত আল-মাসাবীহ' কিতাবে এ সম্পর্কে হাদীস উলে-খ করা হয়েছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত হাদীসটির পর্যালোচনা নিচে তুলে ধরা হল। হাদীসটি হলঃ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করিম (সাঃ) বলেছেনঃ তুমি কি জান এটা (অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত) কোন রাত? তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসুলাল-াহ! এ রাতে কি রয়েছে? তিনি বললেনঃ এ রাতে এই বছরে যে সকল মানব-সন্ড়ান জন্ম গ্রহণ করবে তাদের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করা হয়, যারা মৃত্যু বরণ করবে তাদের তালিকা তৈরী হয়, এ রাতে আমলসমূহ পেশ করা হয়, এ রাতে রিযক নাযিল করা হয়।

আলোচ্য হাদীসটি আল-মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে 'রামাযান মাসে কিয়াম' (রামাযান মাসের রাতের সালাত) অধ্যায়ে উলে-খ করা হয়েছে।

তিনি লিখেছেন যে, ইমাম বায়হাকী (রঃ) তাঁর আদ-দাওয়াত আল-কাবীর' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির পর্যালোচনা নিচে তুলে ধরা হলোঃ

(এক) উলি-খিত হাদীসে 'অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত' বাক্যটি রাসূল (সাঃ) এর কথা নয়। এ বাক্যটি পরবর্তী কালের বর্ণনাকারীর নিজস্ব বক্তব্য। আর আয়েশা (রাঃ) এমন কোন অজ্ঞ মহিলা ছিলেন না যে তাকে তারিখ বলে দিতে হবে।

(দুই) এ হাদীসে বর্ণিত 'অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত' কথাটি আয়িশা (রাঃ) এর বক্তব্য নয়। কারণ তাঁর বক্তব্য শুর" হয়েছে 'তিনি জিজ্ঞেস করলেন' বাক্যটির পর। তাহলে এ বক্তব্যটি কার? এ বক্তব্যটি রাসূল (সাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারীর নিজস্ব মন্ড়ব্য, যা মেনে নেওয়া আমাদের জন্য জর"রী নয়।

(তিন) এ হাদীসের বিষয়বস্ড়ুর দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, হাদিসে ভাগ্য লেখার বিষয়টি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। কেননা জন্ম, মৃত্যু, আমল পেশ, রিযক ইত্যাদি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়াবলী রামাযান মাসে লাইলাতুল কদরে স্থির করা হয়। একথা যেমন কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তেমনি বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(চার) আল-মিশকাত আল-মাসাবীহর সংকলক বিষয়টি ভালভাবে বুঝেছেন বলে তিনি হাদীসটিকে রামাযান মাসের সালাত (কিয়ামে শাহরি রামাযান) অধ্যায়ে উলে-খ করেছেন। বুঝা গেল যে, তাঁর মত হল হাদীসটি রামাযান মাসের লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত। যদি তিনি বুঝতেন যে, হাদীসটি মধ্য শাবানের, তাহলে তিনি সেটা রামাযান মাসের অধ্যায়ে আলোচনা করলেন কেন?

(পাঁচ) এ হাদীসটি আল-মিশকাত আল-মাসাবীহর সংকলক উলে-খ করার পর বলেছেন, তিনি হাদীসটি ইমাম বায়হাকীর 'আদ-দাওয়াত আল-কাবীর' কিতাব থেকে নিয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'আদ-দাওয়াত আল-কাবীর' গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে মাত্র দুইটি হাদীস উল-াখ করেছেন। তাঁর একটি হল এই হাদীস। তিনি তাঁর 'শুয়া'বুল ইমান' গ্রন্থে এই বইয়ে আলোচিত ৫ নং হাদীসটি উলে-খ করার পর লিখেছেনঃ "এ বিষয়ে বহু মুনকার

হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার বর্ণনাকারীরা অপরিচিত। আমি তা থেকে দুটি হাদীস 'আদ-দাওয়াত আল-কাবীর' গ্রন্থে উলে- খ করেছি"।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে ফলাফল দাঁড়ায় কি? ইমাম বায়হাকীর এ মন্ড়ব্যে যা প্রমাণিত হলঃ

১। শবে বরাত সম্পর্কে অনেক মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীস রয়েছে।

২। আদ-দাওয়াত আল-কাবীর গ্রন্থে বর্ণিত শবে বরাত সম্পর্কে হাদীস দুটি মুনকার।

৩। তাই আলোচ্য হাদীসটি হাদীসে মুনকার।

৪। তিনি আদ-দাওয়াত আল-কাবীর গ্রন্থটি আগে সংকলন করেছেন, তারপরে শুয়াবুল ইমান সংকলন করেছেন। এ কারণে তিনি পরবর্তী কিতাবে আগের কিতাবের ভুল সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করেছেন। এটা তাঁর আমানতদারী ও বিশ্বস্ড়তার একটি বড় প্রমাণ।

৫। মুনকার হাদীস আমলের জন্য গ্রহণ করা যায় না।

৬। যিনি হাদীসটি আমাদের কাছে পৌছিয়েছেন তিনি নিজেই যখন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মতামত দিয়েছেন তখন আমরা তা সঠিক বলে গ্রহণ করব কেন?

সৌভাগ্য রজনী ধর্ম বিকৃতির শামিল

ইসলাম ধর্মে সৌভাগ্য রজনী বলে কিছু নেই। নিজেদের সৌভাগ্য রচনার জন্য কোন আনুষ্ঠান বা ইবাদাত-বন্দেগী ইসলামে অনুমোদিত নয়। শবে বরাতকে সৌভাগ্য রজনী বলে বিশ্বাস করা একটি বিদ'আত তথা ধর্ম বিকৃত করার শামিল। এ ধরণের বিশ্বাস খুব সম্ভব হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে। তারা সৌভাগ্য লাভের জন্য গনেশ পূজা করে থাকে। সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে এবং সারা জীবন সালাত-সিয়াম-যাকাত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একটি রাতে মসজিদে উপস্থিত হয়ে রাত জেগে ভাগ্য বদল করে সৌভাগ্য হাসিল করে নিবেন, এমন ধারণা ইসলামে একটি হাস্যকর ব্যাপার।

ধর্মে বিকৃতির কৃতিত্বে শিয়া মতাবলম্বীদের জুড়ি নেই। এ শবে বরাত প্রচলনের কৃতিত্বও তাদের। ফারসী ভাষায় 'শবে বরাত' নামটা থেকে এ বিষয়টা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তারা এ দিনটাকে ইমাম মাহাদীর জন্মদিন হিসাবে পালন করে থাকেন। তারা বিশ্বাস করে যে, এ রাতে ইমাম মাহাদীর জন্ম হয়েছে। এ রাতে তারা এক বিশেষ ধরণের সালাত আদায় করে। যার নাম দিয়েছে 'সালাতে জাফর'।

ঈদে মীলাদুন্নবী

এই অংশটুকু "মীলাদ, শবেবরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদআত"-হাফিজ মোঃ আইয়ুব; "মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী"-মাওলানা হাফিজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী থেকে নেওয়া।

মীলাদুন্নবীর ইতিহাস

মীলাদুন্নবী তথা রাসূল (সাঃ) এর জন্ম উৎসব পালনের সূচনার ইতিহাসঃ নবী (সাঃ) এর সময়, খুলাফায়ি রাশেদীনের সময় বা উমাইয়া খালিফাদের যুগে এসব ছিল না। এর বীজ বপন করে আব্বাসীয় খলীফাদের যুগে জনৈক মহিলা। মদীনায় প্রিয় নবী মুহাম্মাদ(সাঃ)

এর রওজা মুবারক যিয়ারত করার ও সেখানে দু'আ করার যে ব্যবস্থা রয়েছে সেভাবে আল-াহর নবী (সাঃ) মক্কার যে ঘরে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন সে ঘরটির যিয়ারত ও সেখানে দু'আ করার সর্বপ্রথম চালু করেন বাদশাহ হার ন্নুর রশিদের মা খায়যুরান বিবি (মৃত ১৭৩ হিজরী ৭৮৯ ঈসায়ী)। পরবর্তীতে ১২ রবিউল আউয়ালকে আল-াহর নবী (সাঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু ধরে নিয়ে তীর্থযাত্রীগণ ঐ ঘরে এসে দু'আ করা ছাড়াও বারাকাতের আশায় ভূমিষ্ট হওয়ার স্থানটি স্পর্শ ও চুম্বন করত-(ইবনু জুবায়ির ৬৩ ও ১১৪ পৃঃ, আল-বা-তালুনী ৩৪ পৃঃ)। এখানে ব্যক্তিগত যিয়ারত ছাড়াও একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। তা ইবনু যুবাইরের (মৃত্যু ৬১৪ হিজরী) গ্রন্থের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় প্রথম জানা যায়।

অতএব হিজরীয় চতুর্থ শতকে উবায়দ নামে একজন ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর নাম রাখা হয় উবায়দুল-াহ। তিনি নিজেকে ফাতেমা(রাঃ) এর সম্ভ্রান্ড় বংশধর বলে দাবী করেন এবং মাহদী উপাধি ধারণ করেন। এরই প্রপৌত্র (পৌত্রের ছেলে) মুয়িয লিদীনিল-াহ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের জন্মবার্ষিকীর অনুকরণে ছয় রকম জন্মবার্ষিকী ইসলামে আমদানী করেন। এবং মিশরের ফাতিমী শী'য়া শাসকরা মুসলিমদের মধ্যে জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি চালু করেন। এ ফাতিমী শী'আ খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবূ মুহাম্মদ উবায়দুল-াহ ইবনু মায়মূন প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন-(আল-বিদা-য়াহ আন নিহাইয়া একাদশ খন্ড, ১৭২ পৃঃ)। কারো মতে তিনি ছিলেন অগ্নিপূজারী (মাকরিজীর আল খুতাত আল আসার ১ম খন্ড ৪৮ পৃঃ)। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মিসরের ফির'আউন জন্মোৎসব পালন করতেন (ফাতা-ওয়া নাযীরিয়্যাহ ১ম খন্ড ১৯৯ পৃঃ)। ফির'আওন ছিল ইয়াহুদী। তারপর ঐ ইয়াহুদী রীতি খৃস্টানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ফলে তারা তাদের নাবী ঈসা(আঃ) এর জন্মবার্ষিকী 'ক্রিসমাস ডে' পালন করতে থাকে।

মুসলিমদের মাঝে এই জন্মবার্ষিকী রীতি চালু হওয়ার 'একশ' বছর পর অর্থাৎ ৪৬৫ হিজরীতে আফজাল ইবনু আমীর ল জায়শ মিশরের ক্ষমতা দখল করে রাসূল (সাঃ), আলী (রাঃ), ফাতিমাহ (রাঃ), হাসান (রাঃ), হুসায়েন (রাঃ) এর নামেসহ প্রচলিত ছয়টি জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি বাতিল করে দেন(মিশরের মুফতি শায়েখ মুহাম্মদ রচিত আহসানুল কালা-ম ফী মাইয়্যাতা আল-াকু বিস সুন্নাতি আল বিদ'আতি মিনাল আহকাম, ৪৪-৪৫ পৃঃ বরাতে তাম্মিহু উলিল আবসা-রা ইলা কামা লিদ্দিন আমা ফিল বিদ'আয়ী মিনাল আখতার ২৩০ পৃঃ)। এরপর ৩০ বছর বন্ধ থাকার পর ফাতিমী শী'আ খালীফাহ আমীর বি-আহকামিল-াহ পুনরায় এ প্রথা চালু করেন। তখন থেকেই জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি চালু হয়ে এখনো চলছে। (ঐ ২৩০-২৩১ পৃঃ)।

ঐতিহাসিক অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জন্মবার্ষিকী পালনের এ রীতি ওই মীলাদ প্রথা খালিফাহ মুস্ড়ালি বিল-া-হর প্রধানমন্ত্রী বদর আল জামালী বাতিল করে দেয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় চালু হলে পরবর্তীতে কুরআন হাদীসের অনুসারী সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী এ সব জন্মবার্ষিকী ও মীলাদ প্রথা বাতিল করে দেন। কিন্তু সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর ভগ্নীপতি এরবলের শাসনকর্তা মুজাফফরউদ্দিন ছাড়া কেউ এর বিরোধীতা করেননি। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, বাদশাহ মুজাফফরউদ্দিনের মীলাদ মাহফিলগুলোতে নামধারী সুফীরা উপস্থিত হন এবং এ মাহফিল ফজর থেকে যুহর পর্যন্ড় চলত। বাদশাহ এ মীলাদের জন্য তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রারও অধিক বেশী খরচ করতেন।

(মাকরিজীর আল খুতাত ১ম খন্ড ৪৯০পৃঃ, মির-আতুয জামা-ন ফী তা-রীখীল আ'ইয়ান ৮ম খন্ড ৩১০ পৃঃ, পূর্বোক্ত তানবিহু উলিল আবসা-র ৩২ পৃঃ)।

এভাবে আস্ড়ে আস্ড়ে সুন্নীদের মাঝে মীলাদুন্নবী ঢুকে পড়ে। তাই শাইখ উমার ইবনু মুহাম্মদ মোল-া নামে এক প্রসিদ্ধ সৎ ব্যক্তি মুসিলে মীলাদুন্নবী করে ফেলেন এরই অনুসরণ করেন এরবলের শাসনকর্তা মুজাফফরউদ্দিন (কিতাবুল বা-য়িস আলা ইনকা-রিল বিদায়ী অল হাওসা-দিস ৯৬ পৃঃ, মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী-শাইখ আব্দুল বারী আলিয়াভী ২০ পৃঃ)। মোল-া উমার ইবনু মুহাম্মদ মুসিলের বাসিন্দা ছিলেন। এরবল মুসিলেরই নিকটবর্তী এলাকা ছিল। তাই আনুমানিক ৬০৪ হিজরীতে সুন্নীদের মধ্যে মীলাদুন্নবীর সুত্রপাত হয়। অতঃপর এরবলের শাসনকর্তা মুজাফফরউদ্দিন তা ধুমধামের সাথে মানতে থাকে। এমতাবস্থায় স্পেনের এক ইসলামী বিদ্বান আবুল খাত্তাব উমার ইবনুল হাসান ইবনু দিহইয়াহ মরক্কো ও আফ্রিকা, মিসর ও সিরিয়া, ইরাক ও খোরাসান প্রভৃতি দেশ ঘুরতে ঘুরতে ৬০৪ হিজরীতে এরবলে প্রবেশ করেন এবং বাদশাহ মুজাফফরউদ্দিনকে মীলাদুন্নবী পালনের ভক্ত হিসাবে দেখতে পান। তাই তিনি রাসূল (সাঃ) এর মিলাদ সম্পর্কে একটি বই লেখেন-'কিতাবুল তানভীল ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে। অতঃপর তিনি এটাকে ৬২৬ হিজরীতে ছয়টি মজলিসে বাদশাহ মুজাফফরউদ্দীনের নিকট পড়ে শুনান। বাদশাহ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মূদ্রা দান করেন-(অফাইয়াতুল আ'য়া-ন ৩য় খন্ড ১২২ পৃঃ)। ফলে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই মরক্কোবাসীরা এর নাম দিয়েছে 'মওসম'। আলজেরিয়াবাসীরা এর নাম দিয়েছেন 'যারদাহ'। মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যবাসীরা এর নাম দেয় 'মাওলিদ। (আল ইনসা-ফ ফীমা কীলা ফল মাওলিদ মিনাল গুলুয়ে অল ইজহা-ফ ২৭ পৃঃ)।

আর ভারতীয় উপমহাদেশে মীলাদুন্নবী আমদানীকারীরা ছিল শী'আ। যেমন ইসলামের মধ্যে প্রথম মীলাদ আমদানীকারক ছিল শী'আ খালীফাহ মুয়ীয লিদীনিল-াহ। ভারতের মোগল সম্রাটদের কিছু মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ছিলেন শী'আ। যেমন মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ও সম্রাট আকবরের মা ছিলেন শী'আ। আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ কট্টর শী'আ ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাষ্ট্রদূত শী'আ ছিলেন। বাদশাহ বাহাদুর শাহ শী'আ ছিলেন। তারাই এ উপমহাদেশে সুন্নীদের মধ্যে মীলাদুন্নবীর প্রচলন করে দেন। ফলে শী'আ-মীলাদুন্নবীর আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো সুন্নীদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে। যেমন-আলোকসজ্জা ও মিছিল প্রভৃতি। (শাইখ আইনুল বারী আলিভিয়া কর্তৃক রচিত 'মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী' পুস্ড়কের ৩৩ পৃঃ)।

ঐতিহাসিকভাবে রাসূল (সাঃ) এর জন্ম তারিখ কোনটি?

ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর মতে মহানবী (সাঃ) এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসে। আল-ামা ইবনুল জাওযী (রাঃ) বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের ঐক্যমতে রাসূল (সাঃ) এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসে-(সীরাতুল মুস্ড়ফা ১ম খন্ডে ৫১ পৃষ্ঠার ২ নং টীকা)। তবে জন্ম তারিখের ব্যাপারে মতভেদ আছে যেমন এ ব্যাপারে ৮টি উক্তি আছে। যথাঃ

১। ২,৮,১০,১২ ও ১৩ রবিউল আউয়াল। (সিফাতুস সফঅহ ১ম খন্ড ১৪ পৃষ্ঠা; আলঅফা বি-আহওয়ালিল মুস্ড়ফার উর্দূ তরজমা সীরাতে সাইয়িদুল আম্বিয়া ১১৭ পৃষ্ঠা)

২। মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবায় জাবির ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ১৮ রবিউল আউয়াল। (আল-বিদায়াহ ওয়ানিহা-য়াহ ২য় খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠা)

৩। ১ রবিউল আউয়াল। (আল ইস্ত্রীআ-বা ১৩ পৃষ্ঠা)

৪। ইবনু হিশাম (রাঃ) বলেন, আল-ামা তাবারী ও ইবনু খালদূনও বলেনঃ ১২ রবিউল আউয়াল। (তাহযীবু সীরাতে ইবনু হিশাম ৩৬ পৃষ্ঠা; তারীকুল উমাম আল-মুলক ১ম খন্ড ৫৭১ পৃষ্ঠা, তারীখ ইবনু খালদূন ২য় খন্ডের শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠা; আলকা-মিল ফিত তারিখ ১ম খন্ড ২৭০ পৃষ্ঠা)

৫। আল-ামা ইবনুল আব্দিল বার ২ রবিউল আউয়াল বলা স্বত্তেও বলেন যে, ঐতিহাসিকগণ ৮ রবিউল আউয়ালের সোমবারকেই সঠিক বলেছেন। (আল-ইস্ত্রীআ-ব ১৪ পৃষ্ঠা)

৬। ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনু আলীর মতে ১০ রবিউল আউয়াল এবং আবূ মাশার নাজীহ মাদীনার মতে ২ রবিউল আউয়াল সোমবার। (তাবাকাতে ইবনু সা'দ ১ম খন্ড ৮০-৮১ পৃষ্ঠা)

৭। কনস্টান্টিনোপলের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মাহমূদ পাশা তাঁর যুগ থাকে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ড় ক্যালেন্ডার ঘেটে প্রমাণ করেছেন যে সোমবার দিনটি ১২ রবিউল আউয়াল কোন মতেই পড়ে না। বরং তা ৯ রবিউল আউয়ালই সঠিক হয়। এজন্য সঠিক বর্ণনা ও জ্যোতর্বিদদের গণনা হতে রাসূল (সাঃ) এর জন্মদিনের নিভ্রযোগ্য তারিখ ৯ রবিউল আউয়াল। (কাসাসুল কুরআন ৪র্থ খন্ড ২৫৩-২৫৪ পৃষ্ঠা)

৮। হাদীস ও ইতিহাসের বহু মহা বিদ্বান- যেমন আল-ামা হুমায়দী, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনু কাইয়্যিম ও ইবনু কাসীর, ইবনু হাজার আল আসক্বালানী ও বাদর-দ্দীন আয়নী (রাঃ) প্রমূখের মতে ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূলুল-াহ (সাঃ) এর জন্মদিন-(কাসাসুল কুরআন ৪র্থ খন্ড ২৫৩ পৃষ্ঠা)। সমস্ড় বর্ণনা প্রমাণ করে যে, রাসূল (সাঃ) এর জন্মক্ষণ, জন্মতারিখ, জন্মসন এসবেই মতভেদ আছে। কেবল একটা ব্যাপারেই সকলে একমত যে, তাঁর জন্মদিনটি ছিল সোমবার- (মুসলিম ১ম খন্ড ৩৬৮ পৃষ্ঠা)। তা অন্য কোন বার ছিল না।

এবং প্রায় সবাই একমত রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যু হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে। এ সম্পর্কে তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া হয় যে, রাসূল (সাঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু হয়েছিল ১২ই রবিউল আউয়ালে, তাহলে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের অনুকরণে ১২ই রবিউল আউয়ালে মীলাদুন্নবী তথা নাবী (সাঃ) এর জন্মবার্ষিকী খুশী মানানো হয় অথচ ঐ দিনেই নবী (সাঃ) এর ইন্ড়েকালের শোক পালন করা হয় না কেন? একথাই সবাই একমত যে, একই দিনে আনন্দ ও দুঃখ একত্রিত হলে দুঃখের মধ্যে আনন্দ ম-ান হয়ে যায়। তাই ১২ই রবিউল আউয়াল মীলাদুন্নবীর উৎসব পালন না করে নাবী (সাঃ) এর মৃত্যুর শোক পালন করাই যুক্তিযুক্ত হ'ত।

ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন অবৈধ

আল-কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীস দ্বারা কারো জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না।

রাসূল (সাঃ) যারা সবচেয়ে ভালবাসতেন সে সব সাহাবীগণ বিশ্বনবী (সাঃ) এর জীবিতকালে অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেননি। এমনকি রাসূল (সাঃ) এর একমাত্র পুত্র ইবরাহীম ছাড়া বাকী পুত্রগণ তাদের জন্মের এক বছরের মধ্যেই মারা যান। শুধু ইবরাহীম ১৬ মাস বয়সে মারা যায়। এজন্য নবী (সাঃ) এত দুঃখিত হন যে, তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে-(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৫০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এ আদরের ছেলেটির জন্মের দ্বিতীয় বছরে রাসূলুল-াহ (সাঃ) তাঁর মৃত্যু অথবা জন্মোৎসব পালন করেন নি।

রাসূলকে (সাঃ) এর জীবিতকালে ওয়াহী দিবস, কুরআন নাযিল দিবস, পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদাম (আঃ) এর জন্ম বা মৃত্যু দিবস, মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম (আঃ) এর জন্ম বা মৃত্যু দিবস এসেছে কিন্তু রাসূল (সাঃ) এভাবে কোন নবীদের স্মরণে বা কোন সাহাবীর শাহাদাত দিবস অথবা কোন জিহাদের দিবস পালন করেননি এবং নির্দেশ ও দেননি। বরং তিনি বলে গেছেন, আমার পরে আমার শরী'আতের মধ্যে যে সকল নতুন কর্ম আবিষ্কার হবে, আমি তা হতে সম্পর্কহীন এবং ওই সকল কাজকর্ম মারদূদ, পরিত্যাজ্য ও ভ্রষ্ট-(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১/১৩৩)। তাই মীলাদুন্নবী ও মৃত্যুবার্ষিকী কিংবা কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে বিদ'আত তথা মনগড়া কাজ। আর ইতিহাসের দৃষ্টিতে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের অন্ধ অনুসরণ তথা ইসলাম বিরোধী কাজ। আর এসব জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালন তো বৈধ নয়ই বরং এগুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকা জর"রী।

সাহাবায়ে কিরাম ও মীলাদুন্নবী

রাসূল (সাঃ) এর ইন্ড়কালের পর একাধিক্রমে পঞ্চাশ বছর মুসলিম জাহানের শাসন ক্ষমতা ছিল চার খলিফার হাতে এবং অনেকের মতে পঞ্চম খলিফা হযরত মুয়াবিয়াহ। এর মধ্যে হযরত মুয়াবিয়াহ এর মৃত্যু হয় ৬০ হিজরীতে। নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর একাধিক্রমে পঞ্চাশ বছর ধরে উক্ত পাঁচজন পরমভক্ত সাহাবী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন কিন্তু কেউই ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নবী (সাঃ) এর সম্মানে মীলাদুন্নবী পালন করেননি। নবী (সাঃ) এর এক লাখ চৌদ্দ হাজার সাহাবীর মধ্যে শেষ সাহাবী হযরত আবূ তুফইল আ-মির ইয়ার ওয়া সিলাহ ইহধাম ত্যাগ করেন ১১০ হিজরীতে। নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তাহলে ১০০ বছর পর্যন্ড় কোন না কোন সাহাবী বেঁচে ছিলেন । এই লক্ষাধিক সাহাবীদের কেউই কখনো মীলাদুন্নবী পালন করেননি। এমনকি পরবর্তী তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগেও কেউ তা পালন করেননি।

নবী (সাঃ) বলেন, তোমরা আমার সাহাবীদের সম্মান কর। কারণ তারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী (তা-বেয়ী), এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী (তাবে-তাবেয়ী)। এরপর মিথ্যা প্রকাশ পাবে। এমনকি ঐ মিথ্যা যুগের কোন একজন না বললেও মিথ্যা কসম খাবে, মিথ্যা সাক্ষী দেবে (নাসায়ীর বরাতে মিশকাত ৫৫৪ পৃঃ ২ নং টিকা)।

বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বিশ্ববরেণ্য আলিম আল-ামা শায়খ ইবনে বায (রাঃ) বলেন, "মীলাদুন্নবী ও অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা যায়েজ নয়, একারণে সবই ইসলামে নব উদ্ভাবিত বিদ'আত, যা রাসূল (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং পুর্ববর্তী

উত্তম যুগের কেউ করেননি অথচ তারাই রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের ব্যাপারে অধিক জানতেন এবং তাঁর অধিক প্রেমিক ছিলেন। নাবী (সাঃ) বলেন, যে আমাদের দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম) ইত্যাদি। তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের অসংখ্য দলীল উপস্থাপন করেন যা সবই প্রমাণ করে যে, ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি বর্জনীয় বিদ'আত। ["আল বিদা' ওয়াল মুহদাসাত ওয়া মা লা আসলা লাহু"- গ্রন্থের ৬১৯-৬২৬ পৃঃ] এ ব্যাপারে বড় বড় হানাফী আলেমগণ যেমন শাইখ আব্দুর রহমান মাগরিবী হানাফী, আল-ামা হাসান ইবনে আলী (রাঃ), মুজাদ্দিদ আলফে-সা-নী রহিমুল-াহ সহ আরো অনেক বড় বড় আলেমের বক্তব্য ও ফতওয়া রয়েছে ("শবে বরাত , মিলাদ ও মিলাদুন্নবি কেন বিদআত" এবং "মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী" দ্রষ্টব্য)।

বিবিধ নিষিদ্ধ ও অবশ্য পালনীয় আমলসমূহ

নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তারপর দাওয়াত দেওয়া

আমরা সহীহ ইসলাম পদ্ধতি নিজের জীবনে এবং পরিবারের জীবনে প্র্যাকটিস করব এবং এরপরই অন্যদের সে ব্যাপারে উপদেশ দেব। নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিলে অপরকে দাওয়াত দেওয়া বেশি ফলপ্রসূ হয়।

১) আবু যায়দ উসামা ইবনে যায়দ ইবনে হারেসাহ (রাঃ) বলেন, "আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তাঁর নাড়ি-ভুড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তাঁর চাকির চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তাঁর কাছে একত্র হয়ে তাকে বলবে, 'ওহে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ দিতে ও অসৎ কাজে বাধা দান করতে? সে বলবে, "অবশ্যই, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিতাম কিন্তু তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই তা করতাম। সহীহ। রিঃস্বঃ ১/২০৩; সঃবুঃ ৩২৬৭,৭০৯৮; মুসলিম ২৯৮৯; আহমাদ ২১২৭৭,২১২৮৭, ২১২৯৩।

গোড়ালীর নিচে কাপড়, প্যান্ট, লুঙ্গি, পায়জামা ঝোলানো নিষেধ

১) আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন মহান আল-াহতায়ালা তিন প্রকারের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের পাক-পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, একথাগুলো নবী (সাঃ) তিনবার বলেন। আবু যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল-াহর রাসূল (সাঃ)! এ ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত লোকেরা কারা? তিনি বললেন, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, যে ব্যক্তি উপকার করে উপকারের খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা শপথ দ্বারা পন্যদ্রব্য বিক্রয়কারী। সহীহ। মুসলিম ১০৬, রিঃস্বঃ ৭৯৪, ২/৩৬৭; তিরমিযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৬৫৪, ৪৪৫৮, ৪৪৬৯; আঃদাঃ ৪০৮৭; ইঃমাঃ ২২০৮; আহমাদ ২০৮১১, ২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০; দারেমী ২৬০৫।

২) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে ঝোলানোর কাজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ এগুলো ঝুলিয়ে পড়লে গুনাহ হয়। যে ব্যক্তি অহংকার

বশতঃ কিছু মাটিতে ছেচড়ে চলবে, আল-াহ কিয়ামতের দিন তাঁর দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবেননা। সহীহ। বুঃ ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, মুঃ ২০৮৫, তিঃ ১৭৩০, ১৭৩১, আঃদাঃ ৪০৮৫, ৪০৯৪, নাসাঈ ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ইঃমাঃ ৩৫৬৯, আহমদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩।

৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলে, আল-াহ পাক কিয়ামতের দিন তাঁর প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেননা"। সহীহ। বুঃ ৫৭৮৮, মুঃ ২০৮৭, আহমাদঃ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, মুয়াত্তা মালেকঃ ১৬৯০।

৪) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, লুঙ্গির বা নিচের পরিধেয় জামার যে পরিমাণটুকু পায়ের গাটের নিচে যাবে সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে। সহীহ। বুঃ ৫৭৮৭, নাসায়ী ৫৩৩০, ৫৩৩১, আহমাদ ৪৭১৭, ৭৭৯৭, ৯০৬৪, ৯৬১৮, ১০১৭৭।

পুর"ষদের জন্য রেশমী (সিল্ক) কাপড় ও স্বর্ণ হারাম

১) আবু আমীর আশ-আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দল সৃষ্টি হবে, যারা ব্যাভিচার ও রেশমী কাপড় হালাল মনে করবে। সহীহ। আঃদাঃ ৪০৩৯, বুঃ ৫৫৯০।

২) হুযাইফাহ (রাঃ) থাকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (সাঃ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে আমাদের পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও চিকন রেশমী বস্ত্র পরিধান ও তাতে উপবেশন করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ। বুঃ ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩৭, মুঃ ২০৬৭, তিঃ ১৮৮৭।

৩) আবু মুসা (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের নারীদের জন্য সোনা ও রেশম ব্যবহার হালাল করা হয়েছে এবং পুর"ষদের উপর হারাম করা হয়েছে। সহীহ। তিঃ ১৭২০, নাসায়ী ৫১৪৮।

৪) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (সাঃ) কে দেখেছি, তিনি ডান হাতে রেশম ও বাম হাতে সোনা ধরে বললেন, আমার উম্মতের পুর"ষের জন্য এ দুটি বস্ড়ু হারাম। সহীহ। আঃদাঃ ৪০৫৭, নাসায়ী ৫১৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৯৫।

নামাজ না পড়া মানে....

১) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সাঃ) বলতে শুনেছি, "নিশ্চই কোন ব্যক্তির কাফের ও মুশরিক হওয়ার কারণ হলো সালাত পরিত্যাগ করা। সহীহ। মুঃ ২৫৬, ২৫৭, মিশকাত ৫৬৯।

২) আব্দুল-াহ ইবনে যুবাইদা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমাদের ও তাদের (কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে, তা হলো সালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিবে সে কুফরী করবে। সহীহ। তিঃ ২৬২১, ২/৯০পৃঃ, "ঈমান অধ্যায়", 'সালাত ত্যাগ করা অনুচ্ছেদ', নাসাঈ ৪৬৩, ইঃমাঃ ১০৭৯, মিশকাত ৫৭৪।

৩) অন্য বর্ণনার এসেছে, "যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিবে সে শিরক করবে"। সহীহ ইঃমাঃ ১০৮০।

৪) আব্দুল-াহ ইবনু শাক্বীক্ব উকায়নী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণ আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফরী বলতেন না, সালাত ব্যতীত। সহীহ। তিঃ ২৬২২, ২/৯০পৃঃ, মিশকাত ৫৭৯।

নামাজ না পড়ার পরকালীন শাস্ড়ি

নামাজ না পড়া ও নামাজের প্রতি উদাসীনতার পরিণাম সম্পর্কে আল-াহ তা'আলা বলেন, তাদের পরে যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল তারা নামাজ নষ্ট করলো আর নফসের লালসা-বাসনার অনুসরণ করল। অতএব সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন তারা এই কুকর্মের শাস্ড়ি ভোগ করবে। অবশ্য তারা ব্যতীত যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎ কর্মশীল হয়েছে। (সূরা মরিয়ম-৫৯)

সুতরাং ওয়াইল নামক দোযখের কঠিন শাস্ড়ি সেই নামাজ আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন। (সূরা মাউন-৪-৫)

অর্থাৎ নামাযীদের মধ্যে ঐসব নামাযী, যারা নামাজ পড়ে বা আদায় করে বটে তবে তা যথা সময়ে ও সঠিক নিয়মে আদায় করে না। নামাজের ব্যাপারে আলস্য ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে থাকে। এসব লোকও কিয়ামতের দিন শাস্ড়ির সম্মুখিন হবে নামাযের প্রতি অনীহা প্রদর্শনের কারণেই।

"তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? উত্তরে তারা বলবেঃ আমরা নামায আদায়কারী লোকেদের মধ্যে শামীল ছিলামনা, (অর্থাৎ আমরা নামাজ পড়তাম না) এমতাবস্থায় সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা। (সূরা আল মুদ্দাসসির ৪২-৪৩-৪৮)

হযরত আব্দুল-াহ ইবনে আমর ইবনুল আস কর্তৃক নবী করিম (সাঃ) হতে বর্ণিতঃ একদা তিনি নামাজের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন বললেন। যে লোক এ নামাজ সঠিকভাবে ও যথাযথ নিয়মে আদায় করতে থাকবে। তাদের জন্য কিয়ামতের দিন একটি নূর, অকাট্য দলীল ও পূর্ণ মুক্তি নির্দিষ্ট হবে। পক্ষান্ড়রে যে লোক সঠিকভাবে নামাজ আদায় করবে না তাদের জন্য নূর, অকাট্য দলীল ও মুক্তি কিছুই হবে না। বরং কিয়ামতের দিন তাদের পরিণতি হবে কার-ন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফ এর সাথে। (আহমাদ, দারেমী, বায়হাকী)

এ হাদীসে বে-নামাজীর নিকৃষ্ট পরিণামের কথা বুঝাবার জন্য নবী করিম (সাঃ) মানব ইতিহাসের চারজন নিকৃষ্টতম ব্যক্তির নাম উলে-খ করে বলেছেনঃ বে-নামাজী লোক কিয়ামাতের দিন ঐ চার ব্যক্তির সঙ্গী হবে। চার ব্যক্তির সঙ্গী হওয়া প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন, হয় সে তাঁর ধন-সম্পদের ব্যাপারে বেশি মশগুল থাকার দর-ন নামাজ সংরক্ষণ করবে না, নয়তো দেশ শাসনের রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ড় থাকার দর-ন অথবা ওজারতি সরকারী-বেসরকারী চাকুরীজনিত ব্যস্ড়তার কারণে কিংবা ব্যবসা-বানিজ্যের ব্যাতিব্যস্ড়তার দর-ন। নামাজ না পড়ার প্রথম কারণটি হলে, তাঁর পরিণতি কার-নের সাথে হবে। দেশ শাসনে বা রাষ্ট্রীয় কাজের কারণটি হলে, তাঁর পরিণতি হবে ফিরআউনের সাথে। আর

ওজারতি বা দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীর কারণে হলে, সে পরকালে হামানের সঙ্গী হবে। আর ব্যাবসা-বানিজ্যের কারণে হলে, পরকালে তাকে উবাই ইবনে খালাফের সাথী হতে হবে। (ফিকাহুস সুন্নাহ)

এতদ্ব্যতীত হাদীসটিতে বে-নামাজী বা নামাজ তরককারীর প্রতি কঠোর তিরষ্কার ও তীব্র ভীতির উলে-খ প্রকট ও প্রচন্ড হয়ে উঠেছে। এতে এ কথাও জানা যায় যে, নামাজ নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে না থাকলে এবং মাঝে মধ্যে কখনো কখনো পড়লে সে নামাজের কোন অর্থ হয় না, নামাযী তা হতে পরকালে কোন ফায়দাও লাভ করতে পারবে না।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করার বিধান

আবূ কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকাত সালাত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) আদায় করার পূর্বে যেন না বসে। সহীহ। বুঃ ৪৪৪, ১১৬৭, তিঃ ৩১৬, নাসায়ী ৭৩০, আঃদাঃ ৪৬৭, ইঃ মাঃ ১০১৩, আহমাদ ২২০২৩, ২২০৭২, মুয়াত্তা মালেক ৩৮৮, দারেমী ১৩৯৩।

জুমার খুতবা দেওয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করতে হবেঃ

জাবীর ইবনু আব্দুল-াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমার দিন নবী (সাঃ) খুতবা দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো ও বসে পড়লো; তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না। তিনি বলেন, "উঠ, দু'রাকাআত সালাত আদায় কর। সহীহ। বুঃ ৯৩০, ৯৩১, ১১৭০, মুঃ ৫৬৫, ৮৭৫, তিঃ ৫১০, ১৩৯৫, ১৪০০, আঃদাঃ ১১৬, ১১১৫, ১১১৬, ইঃমাঃ ১১১২, আহমাদ ১৩৭৫৯।

ইক্বামাত হয়ে গেলে ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য নামাজ নাই

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন নামাজের জন্য ইকামাত দেওয়া হয় তখন ফরজ নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজ নেই। সহীহ। তিঃ ৪২১, ইঃমাঃ ১১৫১, মুসলিম।

অনেককে দেখা যায় ইকামাত দিয়ে দেয়ার পরেও তাড়াহুড়া করে সুন্নাত নামাজ শুর" করে দেন অনেকে, যা নবিজীর(সাঃ) এর আদেশ এর খেলাফ।

ফজরের সুন্নাত ফরজের আগে আদায় করতে না পারলে

১) ফরজ নামাজ আদায়ের পর তা আদায় করবে-

মুঃ ইবনু ইবরাহীম থেকে তাঁর দাদা ক্বাইস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি (ক্বাইস) বলেন, রাসূল (সাঃ) নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে অবসর হয়ে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখলেন। তিনি বলেন, হে ক্বাইস তুমি কি দুই নামাজ একত্রে আদায় করছো? আমি বললাম, হে আল-াহর রাসূল! আমি ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত আদায় করতে পারিনি। তিনি বললেন, তাহলে কোন দোষ নেই (পড়ে নাও)। সহীহ। তিঃ ৪২২, ইঃমাঃ ১১৫১।

২) তা সূর্য উঠার পর আদায় করবে-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত ফরজের আগে আদায় করতে পারেনি, সে সূর্য উঠার পর তা আদায় করে নিবে। সহীহ। তিঃ ৪২৩, সিলসিলাহ সহীহাহ্ ২৩৬১।

পুরুষের জন্য হলুদ রং এর পোষাক পরিধান মাকরূহ

১) আবু বকর বিন আবু শায়াবাহ্ থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) "মুফাদ্দাম" পরতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমি হাসান বিন সুহায়লকে জিজ্ঞেস করলাম, মুফাদ্দাম কি? তিনি বললেন, "হলুদ রঙ এ রঞ্জিত বস্ত্র"। সহীহ। ইঃ মাঃ ১/৩৬০১।

২) উসামা বিন যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি আলী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, রাসূল (সাঃ) আমাকে এবং আমি বলিনা যে, তোমাদেরকেও হলুদ রঙয়ে রঞ্জিত পোষাক পরতে নিষেধ করেছেন। সহীহ। ইঃ মাঃ ২/৩৬০২, মুঃ ২০৭৮, তিঃ ১৬৪, ১৭২৫, ১৭৩৭, নাসায়ী ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১১৯৮, আঃদাঃ ৪০৪৪, আহমাদ ৬১২, ৭১২।

৩) আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আব্দুল-াহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, আমার রাসূল (সাঃ)এর সাথে আযাখির উপত্যকা থেকে আসছিলাম, তিনি আমাদের দিকে তাকালেন, আমার পরনে ছিল হলুদ রঙয়ে রঞ্জিত লুঙ্গি। তিনি বলেন, এটা কি? আমি তাঁর কিসে অপছন্দ, অনুভব করলাম। আমি আমার পরিজনের কাছে এলাম ও লুঙ্গিটি চুলায় নিক্ষেপ করলাম। পরবর্তী দিন রাসূল (সাঃ) আমাকে উক্ত লুঙ্গিটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে বলেন, তোমার পরিবারের কাউকে পরতে দিলেনা কেন? কেননা নারীদের এই রং ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই। হাসান। আঃদাঃ ৪০৬৬, ৪০৩৮, আহমাদ ৬৮১৩।

কালো কলপ ব্যবহার নর-নারী সকলের জন্য নিষিদ্ধ

১) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বক্কর (রাঃ) এর পিতা আবু কুহাফাকে, মক্কা বিজয়ের দিনে এমন অবস্থায় আনা হলো যে তাঁর মাথা ও দাড়ি 'সাগামাহ' ঘাসের (সাদা ফুলের) মত সাদা ছিলো। এ দেখে রাসূল (সাঃ) বললেন, "এ সাদা রঙ পরিবর্তন কর। আর কালো রঙ করা থেকে দূরে থাক।

আরেক বর্ণনায় আছে, কালো রঙ থেকে একে দূরে রাখো। সহীহ। মুসঃ ২১০২, নাসায়ী ৫০৭৬, ৫২৪২, আঃদাঃ ৪২০৪, ইঃমাঃ ৩৬২৪, আহমাদ ১৩৯৯৩, ১৪০৪৬, ১৪২৩১।

২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, এমন একটি কওম আখেরী যমানাতে আসবে যারা কবুতরের পেটের মত কালো রঙের খিজাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের খুশবুটুকুও পাবেনা। সহীহ। সহীহ আত-তারগীব লীল আলবানী ২/২৩৪/২০৯৭, নাসায়ী (তাহক্বীক) হা/৫০৭৫, সহীহ জামেউস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহু ১/১৪২২/১৪১১৩।

৩) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কালো রঙের খিযাব করে, আল-াহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর মুখ কালো করবেন। তাবারানী, মুযমাউয যাওয়ায়েদ ৫/২৯৩/৮৮১৪।

সুদ

হাদিসের বাণীঃ

১) আব্দুল-াহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, সুদের গুনাহের সত্তরটি স্ড়র (প্রকারভেদ) আছে, তারমধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোটটি হচ্ছে, "কোন ব্যক্তি তাঁর মাকে বিবাহ করার (বা যেনা করা) সমতুল্য। সহীহ। ইঃমাঃ ২২৭৫, হাকিম ২/৩৭, আত-তালীকুর রাগীব ৩/৫০,৫১।

২) জাবীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী (সাঃ) সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদ লেনদেনের লেখক ও সাক্ষীদেরকে লানত করেছেন। আর তিনি তাদের সকলকে সমান অপরাধে অপরাধী বলেছেন। সহীহ। মুঃ ১৫৯৮, আহমাদ ১৩৮৫১।

৩) আব্বাস বিন জাফর থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তাঁর সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হবেই। সহীহ। ইঃ মাঃ ৭/২২৭৯।

আল কুরআনের বাণীঃ

১) যারা সুদ খায়, তারা কবর থেকে তাঁর ন্যায় উঠবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এজন্য যে, তারা বলে বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল-াহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন ও সুদ হারাম করেছেন। (সূরা বাকারা ২:২৭৫)

২) আল-াহ তা'আলা সুদকে মিটিয়ে দেন ও সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। (সূরা বাকারা ২:২৭৬)

৩) হে মুমিনগণ! তোমরা সুদ খাবেনা বহুগুণ বৃদ্ধি করে, আর তোমরা আল-াহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফল হও। (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৩০)

৪) হে মুমিনগণ! তোমরা আল-াহকে ভয় কর আর বাকী সুদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও। অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল-াহ ও তার রাসুলের নিকট থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। (সূরা বাকারাহ ২৭৮-২৭৯)

গীবত ও চোগলখোরী

গীবতঃ পরনিন্দা। কোন মানুষের অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে বলা হয় গীবত।

চোগলখোরীঃ একজনের কথা আরেকজনের নিকট বিকৃত করে বলাকে চোগলখোরী বলে। কারো দোষ ত্রূটি বা কোন গোপন বিষয় বা একান্ড় ব্যক্তিগত মতামত অন্যের কাছে প্রকাশ করে শত্রুতা বা সম্পর্ক খারাপ করে দেয়াকে চোগলখোরী বলে।

গীবত ও চোগলখোরের ভয়াবহ পরিণাম

আল-াহ তা'আলা বলেনঃ

১) "গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমরা কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্ড়ুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর, আল-াহকে ভয় কর। নিশ্চই আল-াহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু"। (সূরাহ আল-হুজরাত-১২)

২) "যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাঁর পিছনে পড়ো না। নিশ্চই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে"। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৬)।

হাদিসে আছে

১) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, গীবত কি তা কি তোমরা জান? সাহাবারা উত্তরে বললেনঃ আল-াহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ গীবত তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এটাও কি গীবত হবে? রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তুমি যা বল তা যদি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলেই সেটা হবে গীবত। আর তুমি যা বল তা যদি তাঁর মধ্যে না থাকে তাহলে, সে ক্ষেত্রে সেটা হবে তাঁর প্রতি দেয়া মিথ্যে অপবাদ। (মুসলিম, তিরিমিযী হাঃ ১৮৮৪, মিশকাত হাঃ ৪৬১৭)

২) আব্দুর রহমান ইবনু গানম ও আসমা বিনতি ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, তারাই আল-াহর উত্তম বান্দা, যাদেরকে দেখলে আল-াহর স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল-াহত নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বনধুদেরমধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের অপবাদ দিতে প্রয়াস পায়। (আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত হাঃ ৪৬৫৭)

৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) একদিন মদীনার একটি বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন লোকের চিৎকার শুনলেন। এদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ প্রকাশ্যতঃ কোন বড় বিষয়ের কারণে এদের আযাব দেয়া হচ্ছেনা। এদের একজন প্রস্রাব এর ফোঁটা থেকে বেঁচে চলত না (অর্থাৎ পবিত্রতার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না), আরেকজন চোগলখোরী করে বেড়াত। (বুখারী হাঃ ৫৬২০)

৪) হাম্মাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমরা হুযাইফা (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। তাঁর কাছে বলা হল, একজন লোক অন্য মানুষের কথা উসমান (রাঃ) এর নিকট বলে থাকে (অর্থাৎ চোগলখোরী করে থাকে)। তখন হুযাইফা (রাঃ) বললেনঃ আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (বুখারী হাঃ ৫৬২১, মুসলিম হাঃ ২০০)

৫) গীবত ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ গীবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। সাহাবীগণ বলেনঃ হে আল-াহর রাসূল (সাঃ)! গীবত কিভাবে ব্যভিচার হতে গুরুতর অপরাধ হতে পারে? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ ব্যভিচার করার পর মানুষ আল-াহর নিকট তাওবা করলে আল-াহ তা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি (যার গীবত করা হয়েছে) ক্ষমা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল-াহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন না। (মিশকাত হাঃ ৪৬৫৯)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গীবত কত গুরুতর অপরাধ।

৬) আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করো না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্ম পর্যন্ড় পৌছে গেছে। (বুখারী হাঃ ১৩০৩)

কুরআন মাজীদে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য বলা হয়েছে। তাই গীবত থেকে বেঁচে থাকা জর"রী।

৭) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) কে বললামঃ সাফিয়্যা (রাঃ) এর এরকম ওরকম অর্থাৎ বেটে হওয়া আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন তুমি এমন কথা বললে যা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দিলে তা খারাপ হয়ে যেত (অর্থাৎ উক্ত পানিকে দূষিত করে ফেলত)। তিনি বলেনঃ আমি তাকে জনৈক মানুষের আচরণ নকল করে দেখালাম। তিনি বললেনঃ আমাকে এই পরিমান (সম্পদ) দেওয়া হলেও কারো আচরণ নকল করা আমি পছন্দ করি না। (আবু দাউদ-৪৮৭৫ ও তিরমিযী-২৫০২ এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ)

৮) রাসূলুল-াহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন আমার প্রতিপালক আমাকে মিরাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাঁদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মত। যা দ্বারা তারা তাদের নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরা সেইসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত তথা গীবত করতো এবং তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। (আবু দাউদ হাঃ ৪৮০১, মিশকাত হাঃ ৪৮২৫)

এখানে মানুষের গোশত খাওয়ার অর্থ অন্যের গীবত করাকে ও তাদের সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট করার চেষ্টারত থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

বৈধ গীবত (রিয়াযুস্বালেহীন থেকে নেয়া)

ইমাম নওয়াভী রেহেমাহুল-াহ বলেনঃ যে কোন শরীয়ত সম্মত ও সৎ উদ্দেশ্যে যদি গীবত ব্যতীত উপনীত হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয।

প্রথমতঃ নির্যাতনের বিরূদ্ধে অভিযোগ করা। নির্যাতিত ব্যক্তির জন্য জায়েয আছে যে, সে রাষ্ট্রনায়ক ও বিচারপতি প্রমূখগণ যারা অত্যাচারীকে শাস্ড়ি দিয়ে তাঁর হক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম তাদের নিকট তাঁর প্রতি কৃত নির্যাতনের বিরূদ্ধে অভিযোগ করবে। অতএব সে বলতে পারেঃ অমুক ব্যক্তি আমার উপর এ ধরণের অন্যায় করেছে।

দ্বিতীয়তঃ গর্হিত কাজ দমন ও অবাধ্য ব্যক্তিকে সঠিক পথের দিশারী করার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা। সুতরাং যার সম্পর্কে এ আশা রাখে যে, সে গর্হিত কাজ দমনে সক্ষম তাকে বলবেঃ অমুক এ ধরণের কাজ করতেছে, আপনি তাকে ধমক দিন বা অনুরূপ কিছু বলবেন। গর্হিত কাজ দমন বা অপসারণ করাই কেবল উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য থাকলে তা হারাম বলে বিবেচিত হবে।

তৃতীয়তঃ ফতওয়া তলব করা। প্রশ্নকারী মূফতী সাহেবকে গিয়ে বলতে পারেঃ আমার পিতা, আমার ভাই, আমার স্বামী বা অমুক ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার প্রতি অন্যায় করেছে। এটা করা কি তাঁর উচিত? তাঁর থেকে আমার বাঁচার, আমার হক পাবার এবং অন্যায়

প্রতিরোধ করার কি কোন উপায় আছে? প্রয়োজন বিশেষে এটা জায়েয। তবে সতর্কতামূলক এরকম বলা উত্তম যে, অমুক ব্যক্তি বা স্বামী যার ব্যাপারটা এ ধরণের, তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? কেননা কাউকে নির্দিষ্ট না করে উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জন করা সম্ভব। এতদসত্ত্বেও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উলে- খ করে ফতওয়া তলব করা জায়েয।

চতুর্থতঃ মুসলমানদের অনিষ্টকর কাজ থেকে সতর্ক করা ও সদোপদেশ দেওয়া। এটা কয়েক ধরণের হতে পারেঃ

১। হাদীসের বর্ণনাকারী ও সাক্ষ্য প্রদানকারীদের দোষ-ত্রুটি ব্যক্ত করা মুসলিম উম্মাতের ইজমা অর্থাৎ একমতে ভিত্তিতে জায়েয, বরং প্রয়োজনের ডাকে তা ওয়াজিব।

২। পরামর্শ দেয়া। যেমন; বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদিতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে, আমানত রাখার ব্যাপারে, লেনদেনের ব্যাপারে অথবা প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে খোজ-খবর ও আতাপাতা নেয়া। এক্ষেত্রে পরামর্শদাতার প্রতি ওয়াজিব যে, সে যেন তাঁর (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির যার সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে তাঁর) অবস্থা গোপন রাখে, বরং সদোপদেশের নিয়্যতে তাঁর সমস্ড় দোষ-ত্রুটি উলে- খ করবে।

৩। যখন কোন জ্ঞানার্জনকারীকে কোন বিদ'আতি ও ফাসেক (পাপী) এর নিকট জ্ঞানার্জন করার জন্য যেতে-আসতে দেখে এ আশংকা করবে যে, সে এতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, তখন তাঁর সামনে এ ধরণের শিক্ষাদাতাদের অবস্থা তুলে ধরে অবশ্যই তাকে উপদেশ দিবে। তবে শর্ত হলো এই যে, উদ্দেশ্য তার কেবলই উপদেশ প্রদানই হতে হবে। কেননা এ ব্যাপারে অনেকেই ভ্রান্ড়ির শিকার হয়ে থাকে; এভাবে যে, শয়তানের চক্রান্ড়ে পড়ে হিংসার বশবর্তী হয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্জনে বাধা দেয় ও শয়তান তাঁর মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করা যে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। অতএব ব্যাপারটি সূক্ষভাবে বুঝা উচিত।

৪। অর্পিত দায়িত্বে অনুপযুক্ত, ফাসেক বা অলস ইত্যাদি হওয়ার কারণে পূণ্রূপে তা পালন করতে অপারগ হলে তাঁর ব্যাপারটা সর্বোচ্চ পদের অধিকারীর নিকট পেশ করা জরূরী, যেন সে তাকে পদচ্যুত করে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এ দায়িত্ব অর্পন করে অথবা তাঁর অবস্থা জেনে সে মোতাবেক তাঁর সাথে আচরণ করে। তাঁর সম্পর্কে ধোকায় পতিত না হয়ে তাকে সংশোধন হবার সুযোগ দিবে অথবা তাকে পরিবর্তন করবে।

৫। কেউ প্রকাশ্যে কোন পাপ বা বিদ'আতী কাজ, যেমন- প্রকাশ্যে মদ্যপান করা, লোকের প্রতি অন্যায় করা, (জোরপূর্বক) কর আদায় করা, অন্যায়ভাবে কারো মাল-হরণ করা এবং বাতিল ও নাহক কাজের নেতৃত্ব দেওয়া, করলে তা আলোচনা করা বা উলে- খ করা বৈধ। পক্ষান্ড়রে কোন বৈধকারী কারণ ব্যতীত তাঁর দোষ-ত্রুটি উলে- খ করা হারাম।

৬। পরিচয় দেয়া। কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ কোন উপাধিতে পরিচিত থাকে; যেমন- রাতকানা, খোড়া, বধির, দৃষ্টিহীন ও টেরা ইত্যাদি- তাহলে উক্ত উপাধি দ্বারা তাঁর পরিচয় দেওয়া জায়েয, এই শর্তে যে, যেন তাঁর অসম্মান করার উদ্দেশ্য না থাকে। এভাবে পরিচয় দেওয়া জায়েয হওয়া স্বত্তেও সম্ভব হলে অন্য কিছু দ্বারা তাঁর পরিচয় দেয়াটাই উত্তম।

গীবত বৈধ হওয়ার উক্ত ছয়টি কারণ উলামায়ে কিরাম উলে- খ করেছেন, যার অধিকাংশই ইজমা দ্বরা প্রতিষ্ঠিত। মশহুর হাদীসসমূহে এসবের দলীল প্রমাণ রয়েছে। কতিপয় দলীল নিম্নে উলে- খ করা হল।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর নিকট ভেতরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি বলেনঃ তাকে অনুমতি দাও। গোত্রের সে নিকৃষ্ট ভাই। (মুত্তাফাকুন আলাইহ্ (বুখারী ৬০৫৪ ও মুসলিম ২৫৯১)

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে বললামঃ আবূ জাহম ও মুয়াবিয়া আমাকে বিয়ের প্রস্ত্মাব দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ মু'আবিয়া তো দরিদ্র, তাঁর কোন ধন-সম্পদ নেই আর আবূ জাহম তাঁর কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। (মুত্তাফাকুন আলাইহ্ (মুসলিম ২৫৯১ ও বুখারী বর্ণনা করেননি))

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু সুফিয়ান এর স্ত্রী হিন্দ (রাঃ) নবী (সাঃ) কে বললেনঃ আবূ সুফিয়ান কৃপন লোক। তিনি আমার ও আমার সন্ত্মানদের পরিমাণ খরচ দেননা। শুধু এতটুকু, যা আমি তাঁর অজান্ড়ে নিয়ে থাকি। তিনি বললেনঃ নিজের ও বাচ্চাদের প্রয়োজন পরিমান নিও। মুত্তাফাকুন আলাইহ্ (বুখারী ২২১১, ও মুসলিম ১৭১৪))

তাবিজ ব্যবহার

হাদীসের আলোকে তাবিজ হারাম হওয়ার স্বপক্ষে বহু সহীহ হাদীস আছে। তন্মধ্যেঃ

১) "ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তির হাতে তামার তাবিজ দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি? সে বললঃ এটা ওয়াহেনার অংশ। তিনি বললেনঃ এটা খুলে ফেল, কারণ এটা তোমার দূর্বলতা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। যদি এ তাবিজ বাধা অবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহলে কখনো সফলকাম হতে পারবে না"। (সহীহ মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ)

২) উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি তা'বিজ ব্যবহার করবে, আল-াহ তাকে পূর্ণতা দিবে না, যে কড়ি ব্যবহার করবে, আল-াহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না"। (সহীহ মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)

৩) "উকবা বিন আমের আল জোহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর দলটির নয়জনকে বায়েত করলেন এবং একজনকে করলেন না। তাঁরা বললঃ হে আল-াহর রাসূল! নয়জনকে বাই'আত করলেন একজনকে বাদ রাখলেন? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তাঁর সাথে একটি তাবিজ রয়েছে। তখন তাঁর হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর তাকেও বাই'আত করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করল সে শিরক করল। (সহীহ মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)

৪) একদা হুযায়ফা (রাঃ) এক রোগীকে দেখতে এসে তাঁর বাহুতে একটি তাগা দেখতে পেলেন, অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন বা ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, যারা আল-াহর উপর ঈমান এনেছে, তাদের অনেকেই শিরক করছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

এ থেকে প্রমাণিত হয়, হুযায়ফা (রাঃ) এর মতে তা'বিজ ব্যবহার করা শিরক এবং সর্বজন বিদিত এই যে, এটা তাঁর মনগড়া কথা নয়। (অর্থাৎ নিশ্চই এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশনা পেয়েই তিনি একথা উলে- খ করেছেন)।

৫) উবায়দ বিন তামিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবু বশীর আনসারী (রাঃ) বলেন যে, তিনি এক সফরে রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গী ছিলেন। আব্দুল-াহ বিন আবু বকর বলেন, আমার বিশ্বাস, তিনি (আবু বশীর) বলেছেন যে, মানুষ তাদের বাসস্থানে অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ) এক লোককে এই বলে পাঠালেন যে, উটের গলায় ধনুকের মত ছিলা অথবা (তা'বিজ জাতীয়) বেল্ট রাখবেনা, সব কেটে ফেলবে।

ইবনে হাজর (রাঃ) ইবনে জাওযীর (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ ধনুকের ছিলা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তিনটি রায় রয়েছে। তাঁর মধ্যে একটি হল তাদের ধারণা অনুযায়ী উটের গলায় ধনুকের ছিলা ঝুলিয়ে দিত, যাতে বদ নজর না লাগে। সুতরাং উহা কেটে ফেলার উদ্দেশ্যই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, ধনুকের ছিলা আল-াহর নির্দেশের বিপরীতে কিছুই করতে পারে না। আর এটা ইমাম মালেকের (রাঃ) বর্ণনা। ইবনে হাজর (রাঃ) বলেন, মুয়াত্তা মালেকের মধ্যে উক্ত হাদীসের বর্ণনার পরেই ইমাম মালেকের (রঃ) কথাটি এসেছে।

মুসলিম (রঃ) ও আবু দাউদ (রঃ) ইমামদ্বয় কিতাবসমূহে উক্ত হাদীসের পর উলে-খ করা হয়েছেঃ মালেক (রঃ) বলেছেনঃ "আমার মতে, বদ নজর বলতে কোন কিছুই নেই বলেই এই আদেশ দেয়া হয়েছে"।

মৃত্যুর পর মানুষ যা দ্বারা উপকৃত হবে

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাঁর সমস্ড় আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি আমল ব্যতীত-

১। সদকায়ে যারীয়াহ(কাউকে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা, কাউকে হাফেয পড়ানো, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুলে দান করা, কাউকে কুরান, হাদীস গ্রন্থ, এমনি বই বিতরন করা, যা যতদিন কেউ না কেউ জ্ঞান চর্চা করবে,বই পড়বে, ততদিন সওয়াব পাবেন আপনি, এমনকি মৃত্যের পরেও তা চলতে থাকবে)

২। এমন ইলম্ যার দ্বারা (অন্যরা) উপকৃত হতে থাকবে।

৩। সৎ সন্ড়ান, যে তাঁর (মৃতের) জন্য দু'আ করবে। [সহীহ। মু: ১৬৩, তি: ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আ: দা: ২৮৮০, ৩৫৪০, আ: ৮৬২৭, দারেমী ৫৫৯]

অপর বর্ণনাতে আরো যোগ করা হয়েছে-

৪। সৎ সন্ড়ান যাকে সে রেখে গিয়েছে সেই সন্ড়ান দ্বারা কৃত ইবাদাত, নেক আমল যা তিনি শিখিয়ে গেছেন বা করার জন্য উৎসাহ দিয়ে গেছেন তার একটি অংশের সওয়াব তিনি নিয়মিত পেয়ে যাবেন।

৫। ওই মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে বা করতে সাহায্য করেছে।

৬। এমন জ্ঞান, যা সে অর্জন করেছে ও প্রচার করেছেন।

৭। খননকৃত কূপ (যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়েছে)।

৮। মুসাফিরের জন্য নির্মিত লঙ্গরখানা।

৯। এমন দান খয়রাত যা তাঁর জীবদ্দশায় সুস্থাবস্থায় তাঁর সম্পদ থেকে বের করেছে। উলে-খিত সবকিছুর সওয়াব মৃত্যুর পরও সে পাবে (ইবনু মাজাহ ও ইবনু খুজায়মাহ্, হাসান সনদে)।

বুখারীতে রয়েছে, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মাতা মৃত্যুবরণ করেছে, তাঁর পক্ষ থেকে আমি সাদাকাহ্ করলে তাঁর দ্বারা কি সে উপকৃত হবে? তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, উপকৃত হবে।

বিভিন্ন উপলক্ষে কুরআন খতম পড়ানোর একটা রেওয়াজ আছে যা শুদ্ধ নয়

খতমে কুরআন একটি উত্তম ইবাদাত। এ ইবাদাত দৈহিকভাবে করা হয় বিধায় তা কারো জন্য বিনিময় করা যায় না। দৈহিক ইবাদাত একমাত্র নিজের জন্য আল-াহর উদ্দেশ্যেই করতে হয়। যেহেতু ইবাদাত অর্থ বান্দাহ কর্তৃক আল-াহর কাছে তাঁর আনুগত্য প্রাকাশ করা। সুতরাং বান্দা যদি কোন ইবাদাত করে আল-াহর আনুগত্য প্রকাশ করে তাতে অন্যের কোন ফায়দা নেই। ফায়দা হলো যে ইবাদাত করবে তারই, যদি আল-াহ তা কবুল করেন। সুতরাং কেউ খালেস নিয়্যতে (কোন বৈষয়িক স্বার্থ ব্যতীত) খতমে কুরআন পাঠ করে নিজে সাওয়াব পাবে ঠিক, কিন্তু কেউ খতমে কুরআন বা কুরআন পড়ালে সে কোন সাওয়াব পাওয়ার কথা নয়। কারণ কুরআন মাজীদ নিজে পড়লেই তাঁর সাওয়াব কিংবা বরকত লাভ করা যায়, অন্য কেউ দিয়ে পড়ালে নয়। যেমন সালাত একটি দৈহিক ইবাদত। আপনি কয়েকজন হুজুর ডেকে বিশ / যে কোন সংখ্যক রাকাত সালাত পড়ালে, আপনার কোন সাওয়াব আশা করেন কি? রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি আল-াহর কিতাবের কোন একটি হরফ বা অক্ষর পড়েছে তাঁর বিনিময়ে তাকে সাওয়াব দেওয়া হবে। আর এ সাওয়াব হলো তার দশগুণ। (রাসূল (সাঃ) বলেছেন) আমি বলছিনা যা, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। (সুতরাং এ তিনটি অক্ষর পড়লে ত্রিশটি সাওয়াব পাওয়া যাবে)

অনুরূপভাবে কেউ কুরআন পাঠ করলে আর তা চুপ থেকে কেউ শুনলে সেও সাওয়াব পাবে।

আল-াহ তাআলা বলেছেন- যখন (তোমাদের নিকট) কুরআন মাজীদ পাঠ করা হয় তখন তা খুব মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক। আশা করা যায় তোমাদের প্রতিও রহমত করা হবে।

সুতরাং কুরআন পড়লে ও শুনলেও সাওয়াব পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ কাউকে দিয়ে পড়ালে যে পড়াবে সে সাওয়াব পাবে এমন কোন কথা কুরআন কিংবা রাসূল (সাঃ) এর হাদীসে বলা হয়নি। রাসূল (সাঃ) কুরআন পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন-"তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ কিয়ামাতের দিন কুরআন তাঁর পাঠকারীর জন্য শাফা'তকারী হিসেবে আবির্ভুত হবে।

কিন্তু রাসূল (সাঃ) কুরআন পড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এরকম কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং কেউ কাউকে দিয়ে কুরআন পড়িয়ে সাওয়াব কিংবা বরকতের আশা করা ঠিক নয়। অপরদিকে যারা অর্থের বিনিময়ে কুরআন পড়ে তারা শুধু অর্থের লোভে পড়ে। এজন্য তাঁরা এব্যাপারে আসল কথাটা বলে দেয় না। বললে তো তারা পয়সা পাবে না। সুতরাং এটা এক শ্রেণীর মোল-া-মৌলভীদের পক্ষে একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু তাই নয়, অর্থের বিনিময়ে কুরআন পড়া বা খতম পড়া তাঁর পরিণাম যে কত সাংঘাতিক তা নিম্নোক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়।

হযরত ইমরান ইবনে হুছবাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জনৈক কুরআন তিলাওয়াতকারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, লোকটি তখন কুরআন পড়ে পড়ে (মানুষের নিকট) কিছু অর্থ চাচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী 'ইন্নালিল-াহ' পড়ে বললেন, আমি রাসূল (সাঃ) বলতে শুনেছি; "যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে যেন এর দ্বারা কেবল আল-াহর কাছেই চায় (অর্থাৎ কুরআন পড়ে তাঁর বিনিময় শুধুমাত্র আল-াহর কাছেই চাইবে)। কেননা, অচিরেই এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পাঠ করে তাঁর বিনিময় মানুষের কাছে চাইবে। [সুনান আত-তিরমিযীঃ কিতাবু সাওয়াবিল কুরআন, হা নং ২৯১৭। (আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান]

হযরত বুরায়দা আল আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের নিকট থেকে কিছু খাওয়ার বিনিময়ে যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাঁর মুখমন্ডলে হাড় থাকবে, তাঁর উপর গোশত থাকবেনা। (অর্থাৎ অভিশপ্ত অবস্থায় কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে)। [মিশকাতুল মাসাবীহ, হা নং ২২১৭ (আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে সহীহ)]

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা কুরআন পাঠ করো, কিন্তু তাঁর বিনিময়ে কিছু খাবে না। (অর্থাৎ) তাঁর কোন বিনিময় গ্রহণ করবে না। তাঁর বিনিময়ে (সাওয়াব ছাড়া) বেশী কিছু চাইবে না, তা থেকে কাউকে দূরে সরিয়ে দেবে না এবং তাতে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। [সিলিসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছহীহা, আলবানী, হা নং ২৬০]

বিভিন্ন সাহাবী হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসে, কোনটিতে রাসূল (সাঃ) চলি-শ দিনে (আঃতিঃ হা/১৯৪৭), সর্বনিম্ন তিন দিনে (আঃদাঃ হা/১৩৯১) কখনো সর্বনিম্ন সাত দিনের (আঃবুঃ হা/৫০৫৪) কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন।

আল-ামা শায়খ নাসির-দ্দিন আলবানী (রা:) তাঁর "আহকামুল জানায়েয" গ্রন্থে (পৃ: ১৯২-১৯৩, ১৭৫-১৭৬), হাফিজ ইবনু কাসীর তাঁর "তাফসীর ইবনু কাসীর" এর সূরা আন নাজম: ৩৯ এর তাফসীর করতে গিয়ে, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তার "আল ইকতিযা" গ্রন্থে ও আম্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগের প্রদান ডা: মাহের ইয়াসীন আল ফাহ্ল রিয়াযিস স্বালেহীন" গ্রন্থের তাহক্বীক্ব করতে আলমাজমু" (৫/১৮৫) গিয়ে সবাই এক বাক্যে বলেছেন: যদি কেউ কুরআন তিলওয়াত করে তার সওযাব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হাদিয়া দেয়, তাহলে তা তাঁদের নিকট পৌঁছবে না।

[বি: দ্র: সুতরাং খতমে বুখারী পড়ানোর ব্যাপারে বুঝতেই পারছেন, এটিও অযাচিত ও নব-আবিস্কৃত ধর্মীয় রীতি বৈ কিছু নয়]

[সূত্র: রি: স্ব: ৪৪৮-৪৪৯ পৃ: একশ' অশুদ্ধ ও শুদ্ধ বিষয় –আবুল কালাম আযাদ]

শিষ্টাচার ও অন্যান্য

১। আব্দুল-াহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল(সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খায় তখন যেন ডান হাতে খায়, ও যখন পান করে তখন যেন ডান হাতে পাত্র

ধরে খায়। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।[সহীহ। মুসলিম হাদীস একাডেমী-২০২০, ইসলামিক সেন্টার-৫১০৪]

২। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যাতে দাঁড়িয়ে পানি পান না করে।[সহীহ। মুসলিম, হা,একাডেমী-২০২৬ ; ই, সেন্টার-৫১১৮].

৩। আবু হুরাইরা(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের পার্থিব বিপদ দূর করবে আল-াহতায়ালা পরকালে তাঁর বিপদ থেকে কোন বিপদ দূর করবেন। কোন অভাবগ্রস্থকে সাহায্য করবে আল-াহতায়ালা তার ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তাকে সাহায্য করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন করবে, আল-াহতায়ালা ইহকাল আর পরকালে তার দোষত্রুটি গোপন করবেন। [সহীহ মুসলিম, হা, একাডেমী- ২৬৬৯; ই, সেন্টার- ৬৬৬১]।

৪। নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল (সাঃ) কে নিজ কানে বলতে শুনেছি যে, হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট। কিন্তু এর মাঝে কিছু অস্পষ্ট বিষয় আছে যার খবর অনেকে রাখে না। যে ব্যক্তি এই সংশয় পুর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও ইযযত কে ত্রুটিমুক্ত রাখতে পারবে। আর যে ব্যক্তি ঐ সংশয় যুক্ত কাজে লিপ্ত হবে সে হারামেই পতিত হবে। শরীরে এমন একটা গোস্ড়ের টুকরা আছে যেটি নষ্ট হলে সমস্ড় শরীরটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে আর তা হলো হৃদয়। [সহীহ। বুঃ৫২, মুসলিম, হা, একাডেমী-১৫৯৯; ই, সেন্টার-৩৯৪৮]।

৫। মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল(সাঃ) বলেছেন, তোমাদের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি, ছোট শিরক বা রিয়া (লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম) এর জন্য। [সহীহ। মুসনাদে আহমদ হা/৪২৯০)

রেফারেন্স বইসমূহ ও সংক্ষিপ্ত সংকেত (যা ভিতরে ব্যবহৃত)

১। সহীহুল বুখারী বঙ্গানুবাদ -তাওহিদ পাবলিকেশন্স (বুঃ)।

২। সুনান আবু দাউদ- তাহক্বীক্ব আল-ামা নাসির-দ্দীন আলবানী (রঃ) অনুবাদ- আহসানুল-াহ বিন সানাউল-াহ- প্রকাশক- মোঃ জিল-ুর রহমান জিলানী। (আঃদাঃ)।

৩। সহীহ আত-তিরমিযী- তাহক্বীক্ব আল-াম নাসির-দ্দীন আলবানী (রঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনা- হুসাইন বিন সোহরাব ও শাইখ মোঃ ঈসা -ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা, সৌদি আরব- (আঃ তীঃ তিঃ)।

৪। স্বলাতে মূবাশশির- আব্দুল হামিদ ফাইযী- (স্বঃ মুঃ)।

৫। ছালাতুর রাসূল (সাঃ)- মুহাম্মদ আসাদুল-াহ আল-গালিব- (ছাঃ রাঃ)।

৬। রাসূল (সাঃ) এর জামাতে নামাজ- মূল- মুহাম্মাদ নাসির-দ্দীন আলবানী (রঃ)-(জাঃ নাঃ)।

৭। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা- মূল- মাসউদ আঃ (রাঃ), ইমাম নাসির-দ্দীন আলবানী, ইমাম বুখারী (রাঃ) শায়খ যুবায়ের আলী ঝাই (হাফি),

শায়খ ইরশাদুল হক আসরী (হাফি)- আনুবাদ ও সংকলন- কামাল আহমদ (কাঃ আঃ)।

৮। জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল-াহ (সাঃ) এর সালাত- মুযাফফর বিন মুহসিন- (মুঃ মঃ)।

৯। তাহক্বীক্ব বুলুগুল মারাম মিন আদিল-াতিল আহকাম- তাওহীদ পাবি-কেশন্স (বুঃ মাঃ)।

১০। নবী করিম (সাঃ) এর নামাজ পড়ার পদ্ধতি- মূল- শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল-াহ বিন বায- ইসলামি দাওয়াত, ইরশাদ, আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়, রিয়াদ, সৌদিআরব, - (বিন বায)।

১১। যুযউ রফউল ইয়াদ্দীন ফিস সালাত- ইমাম বুখারী (রাঃ)-তাওহীদ পাবি-কেশন্স - (যুঃ রাঃ ইঃ)।

১২। যুযউল ক্বিরাত - ইমাম বুখারী (রাঃ)- (যুঃ ক্বিঃ) ।

১৩। তাহক্বীক সুনান ইবনে মাজাহ- তাওহিদ পাবি-কেশন্স।(ইঃমাঃ)

১৪। মীলাদ প্রসঙ্গ- মুঃ আসাদুল-াহ আল গালীব।

১৫। মীলাদ, শবে বরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত- হাফেজ মোঃ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া।

১৬। মহামান্য চার ইমাম এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাদের মহামূল্যবান বাণীসমূহ রাসূলের সূন্নাত অনুসরণে এবং সুন্নাতের পরিপন্থী তাদের কথাসমূহ বর্জনে,-মুঃ ইবরাহীম আল মাদানী ধর্ম মন্ত্রণালয়, সুউদী আরব, দক্ষিণ কোরিয়া।

১৭। আকীদার মানদন্ডে তাবিজ- আলী বিন নূফায়ী আল উলাইয়ানী।

১৮। মুসলিম কি চার মাযহাবের কোন একটা অনুসরণে বাধ্য-মুঃ সুলতান আল-মাসুমী আল-খুজান্দী আল মাক্কী, শিক্ষক, মাসজিদুল হারাম।

১৯। তাক্বলীদ- ইমাম আশ্-শাওকানী (রাঃ)।

২০। সুন্নাতে রাসূল ও চার ইমামদের অবস্থান- আবু আব্দুল-াহ মুহাম্মদ শহীদুল-াহ খান মাদানী।

২১। মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সাওয়াব পৌছে কি?-মুহাম্মদ আব্দুস সালাম।

২২। বিতর্কিত মুনাজাত ও একটি নামাজ আব্দুল হামিদ ফাইযী- (বিঃ মুঃ)।

২৩। আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত?-মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফাখর্ল।

২৪। মাযহাবের স্বার্থে শত শত সহীহ হাদীস বর্জন, ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় কি?-আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুর রহমান (কুরআন সুন্নাহ রিসার্চ সেন্টার)।

২৫। মিলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী-মাওলানা হাফিজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী।

২৬। রাসূল (সাঃ) এর সালাত ও রাত্রি দিনের যিকির-সংকলন ইউসূফ ইয়াসীন।

২৭। নামাজে "আমীন" উচ্চস্বরে বলতে হবে, প্রমাণস্বরূপ ৩৯টি দলিল। মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী।

২৮। বিতর নামাজ- মু, আব্দুল-াহ আল কাফী। (আ: আ: কা:)

২৯। উম্মুল কুরান- আবুল কালাম আযাদ।

৩০। একশ' অশুদ্ধ ও শুদ্ধ বিষয় –আবুল কালাম আযাদ

কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাত অনুযায়ী আমল ও ইবাদত-১১৪

এই বইয়ের সহজ প্রাপ্তিস্থান

আযাদ বুক্স
আন্দরকিল-া, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০৩১-৬২৩৬০২
০১৮১৭-৭০৮৩০২

আয়াত লাইব্রেরী
গুলজার টাওয়ার, চট্টগ্রাম।

ইকরা বুক হাউস
ভিআইপি টাওয়ার, চট্টগ্রাম।

আহসান পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৭১২৫৬৬০

প্রফেসর্স বুক কর্নার
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১৯১৫

তাওহীদ পাবলিকেশন
বংশাল, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৭১১২৭৬২
০১১৯০-৩৬৮২৭২

হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ বংশাল, নতুন রাস্ড়া, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ০২-৭১১৪২৩৮

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

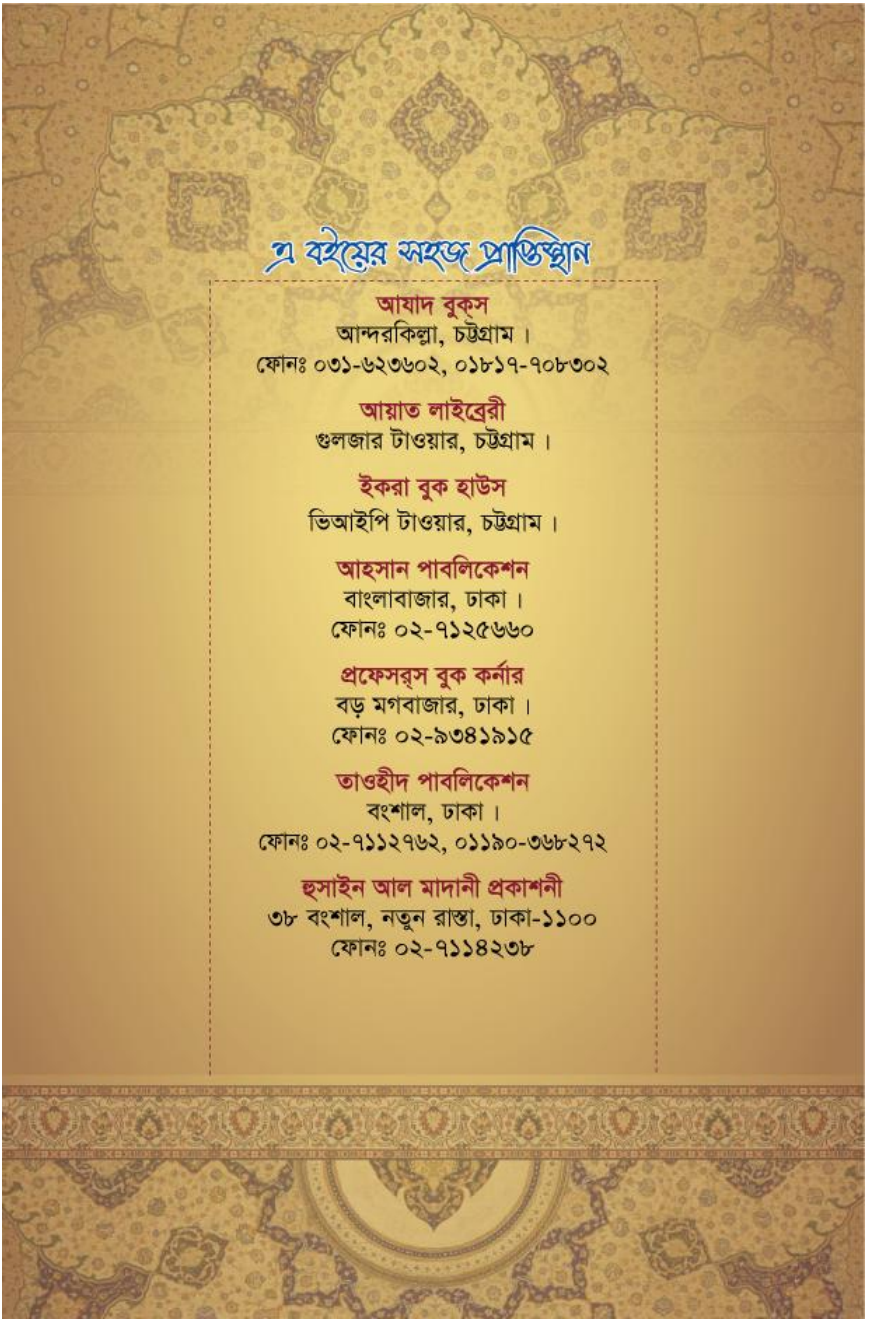
এ বইয়ের সহজ প্রাপ্তিস্থান
আযাদ বুক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০৩১-৬২৩৬০২, ০১৮১৭-৭০৮৩০২
আয়াত লাইব্রেরী
গুলজার টাওয়ার, চট্টগ্রাম।
ইকরা বুক হাউস
ভিআইপি টাওয়ার, চট্টগ্রাম।
আহসান পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৭১২৫৬৬০
প্রফেসর্স বুক কর্নার
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১৯১৫
তাওহীদ পাবলিকেশন
বংশাল, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ বংশাল, নতুন রাস্তা, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ০২-৭১১৪২৩৮